মানব মন

প্রথম বর্ষ তৃতীয় সং
১৫ই জুলাই ১৯

●

এ সংখ্যায় লিখেছে

আই. পি. পাভ
জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ
ডাঃ রুদ্রেন্দ্রকুমার
ডাঃ অজিতকুমার
সত্যেন্দ্রনাথ মজুম
প্রমোদ রঞ্জন সেন

●

মনোবিজ্ঞান - জীববিজ্ঞান - সমাজবিজ্ঞানের আধুনিক ধারা পরিচায়ক ত্রৈমাসিক

With the compliments of

AGFA INDIA LIMITED

198, Jamshedji Tata Road, Bombay-1

Branches at :

Bombay, New Delhi, Calcutta & Madras

Importers and Distributors of Agfa X-Ray, Fluorapid and Dental Films.
Also available are X-Ray Accessories such as cassettes, screens, hangers etc. of welknown German make.

মানবমন
১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা
জুলাই ১৯৬২

সূচীপত্র

১। সম্পাদকীয়… ……… ………………… ৯

২। ইয়ারক্‌স্ ও কোয়েলারের চিন্তাধারা সম্পর্কে —আই, পি, পাভলভ ১২

৩। উপজাতিদের সজ্ঞ চেতনা —সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার ১৭

৪। মানবমনের সুস্থতা ও বিকার (১) —ডাঃ রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল ২৫

৫। পৃথিবীতে প্রাণের সূচনা —জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় ২৯

৬। মানবমনের ক্রমবিকাশ (১)—মনোবিদ ৩৪

৭। মাধ্যমিক শিক্ষায় আমেরিকা, ভারত ও সোবিয়েত—প্রমোদ রঞ্জন সেনগুপ্ত ৪২

৮। মনোরোগীর স্বরূপ নির্ণয় —ডাঃ অজিতকুমার দেব ৬৫

সম্পাদকীয় উপদেষ্টামণ্ডলী

ডাঃ রুদ্রেন্দ্র কুমার পাল
ডাঃ সুধীন বন্দ্যোপাধ্যায়
ডাঃ অজিত দেব
ডাঃ সন্তোষ দাস
ডাঃ সন্তোষ বোস
ডাঃ বিনয় ভট্টাচার্য
ডাঃ নরেশ গঙ্গোপাধ্যায়
ডক্টর অরুণা হালদার
ডক্টর জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য
শ্রীগোপাল হালদার
শ্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
ডাঃ জ্যোতির্ম্ময় শর্ম্মা
ডাঃ সোমনাথ মুখার্জি

তি ফোঁটাই াপনার রক্ত পরিষ্কার রবে!

যে অসংখ্য কোষের সমবায়ে শরীর ও মস্তিষ্ক গঠিত হয়, রক্ত প্রবাহের মাধ্যমেই তারা পুষ্টিলাভ করে ; তাই রক্তকে প্রাণরক্ষার প্রধান উপাদান বলা হয়। সেই রক্তই যখন দূষিত হয়ে পড়ে, তখন স্বভাবতঃই বিবিধ কঠিন ব্যাধির আক্রমণে জীবন দুর্ব্বিষহ হয়ে ওঠে।

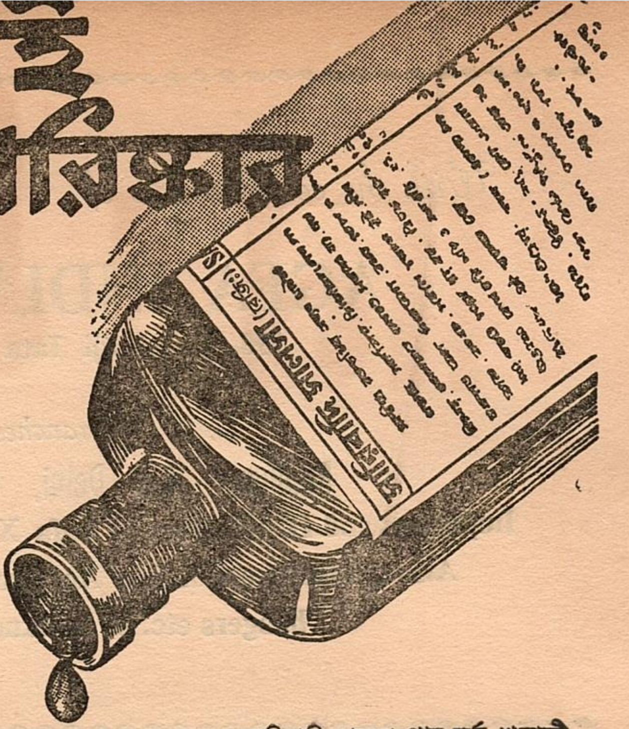

সারিবাদি সালসা প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী যাবত জগতের সর্ব্বত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রক্ত শোধক মহৌষধরূপে প্রসিদ্ধ। সারিবাদি সালসা সেবনে নিয়মিত কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, খোস, পাঁচড়া, দুষ্ট ক্ষত, একজিমা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ চর্ম্মরোগ, বাত ও রক্তে জীবাণু সংক্রমণজনিত সমস্ত কঠিন রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হয়, লিভারের ক্রিয়া স্বাভাবিক হয়, ক্ষুধা বৃদ্ধি পায় এবং শরীরে প্রচুর বিশুদ্ধ নুতন রক্ত সঞ্চারিত হয়।

সারিবাদি সালসা

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রক্ত পরিষ্কারক মহৌষধ

অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ-সি-এস (লণ্ডন), এম-সি-এস (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র—ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম-বি (কলিঃ), আয়ুর্ব্বেদ-আচার্য্য।
৩৬নং গোয়ালপাড়া রোড, কলিকাতা-৩৭

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা

শাখা ও এজেন্সী-পৃথিবীর সর্ব্বত্র

জনসাধারণের সহযোগিতায় উন্নতি ও সমৃদ্ধির অভিযান

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ আশ্রয় ক'রে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটি সফল করার কাজ শুরু হয়েছে। প্রতিটি গ্রামে, খামারে, কারখানায়, ক্ষুদ্র শিল্পে ও কুটীরশিল্পে উন্নতিমূলক কাজ চলেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গে যথাক্রমে ৭২ ও ১৫৫ কোটি টাকা খরচ হয়েছিল। তৃতীয় পরিকল্পনায় সর্বাঙ্গীণ উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে এই ব্যয় বরাদ্দ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে ২৯৩.১৫ কোটি টাকায় ; এর মধ্যে কৃষি ৫৩.৬০ কোটি ; সেচ ও শক্তি ৬৩.৮৬ কোটি ; সমাজ সেবা ৮১.৩২ কোটি ; পরিবহণ ও যোগাযোগ ২৬.৫০ কোটি ; সমবায় ও সমষ্টি উন্নয়ন ১৭.৪৩ কোটি ; শিল্প ও খনি ১২.১৪ কোটি এবং অন্যান্য উন্নয়নমুলক কাজে ৩৮.৩০ কোটি টাকা।

গত দশ বছরে নানা ক্ষেত্রে যে উন্নতি দেখা গেছে তা হচ্ছেঃ খাদ্য ঃ ৩৯.৭ থেকে ৫৪.৫ লক্ষ মেট্রিক টোন ; সেচ ঃ ২৪.৪ থেকে ৩১.৬ লক্ষ একর ; বিদ্যালয় ঃ ১৬,৩১৭ থেকে ৩১,৩১০টি ; ছাত্র ঃ ২০.৫ থেকে ৩৪.২ লক্ষ জন ; হাসপাতাল ও ডিস্‌পেন্সারী ঃ ১,২৮৪ থেকে ১,৯১২টি ; বেড ঃ ১৮,৩২৯ থেকে ২৭,৬১১টি ; ডাক্তার ঃ ১৮,৩৩৬ থেকে ২০,৮৩৪ জন ; নার্স ঃ ২,৯৮৮ থেকে ৫,০০১ জন ; হাতের তাঁতের কাপড় ঃ ১০ থেকে ১৯ কোটি গজ ; পাকা রাস্তা ঃ ১,৩৫২.৯ থেকে ৫,৮৮৮ মাইল ; বিদ্যুৎ ঃ ১০৪.৬৭ থেকে ১৮০.৩৭ কোটি কিলোওয়াট ; পাট ঃ ১.৩৫ কোটি বেল থেকে ১.৮০ কোটি বেল ; কলকারখানা ঃ ২,৫৩০ থেকে ৩,৯৪৩টি ; এবং সমবায় সমিতি ঃ ১৫,৫৮৩ থেকে ২৭,৭১৫টি।

প্রতি দিন, প্রতি মুহূর্তের কঠোর পরিশ্রমেই গ'ড়ে উঠছে
নবভারতের সোনার বাংলা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

WBG-107

অল্প পরিশ্রমেই
আপনি যদি
অবসন্ন হয়ে পড়েন
তখন নিয়মিত ব্যবহারে

ভাইনো-মল্ট

প্রাণোচ্ছল টনিক

আপনাকে
উদ্দীপনা দেবে

বেঙ্গল ইমিউনিটি

/BI/VM/1-59

মূল্যবান

ত্রৈরাশিক

মনে

রাখবেন

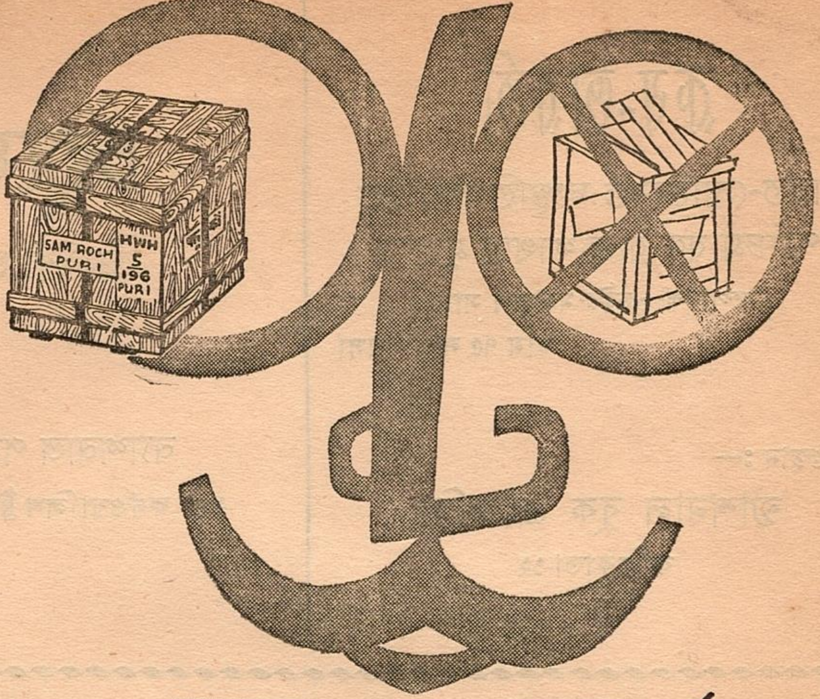

প্যাক লেবেল মার্ক

পাটীগণিতের অন্যতম মূল সূত্র ত্রৈরাশিক পদ্ধতির সাহায্যে বিশেষ ক্ষেত্রে পাওয়া যায় নির্ভুল সমাধান। আর আপনার প্রেরিত মাল নির্দ্ধারিত স্থানে অভ্রান্তভাবে ও অক্ষত অবস্থায় পৌঁছে দেবার নিশ্চিত পদ্ধতি হচ্ছে "পি. এল. এম." নিয়ম মেনে চলা।

আপনার করণীয়—

১। প্যাকিং বাক্স যথেষ্ট মজবুত রাখুন ও পাকাপোক্তভাবে পেরেক লাগান।

২। একটি বা দু'টি পরিচয়পত্র এবং লেবেলের একটি নকল বাক্সের ভেতরে রাখুন।

৩। জল নিরোধক এবং আঘাতসহ দ্রব্য প্যাকিংএর কাজে ব্যবহার করুন।

৪। পুরনো মার্কা থাকলে সে সব যত্নসহকারে তুলে ফেলে নির্ভুলভাবে মার্কা দিন।

৫। পাকা কালিতে পরিষ্কার ও স্পষ্ট করে ঠিকানা লিখুন।

৬। কি ধরণের মাল তা লিখে দিন।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

রুষ-ভারতী

ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির
পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যশাখার মুখপত্র
সম্পাদক—ডক্টর মহাদেব সাহা
দাম ৭৫ নয়া পয়সা

প্রাপ্তিস্থান ঃ—
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি
কলিকাতা-১২

চতুষ্কোণ
ত্রিমাসিকী আলোচনী

ন্যাশনাল পাবলিশার্স
২০৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

'মানব-মন'

কার্য নির্বাহক সমিতি ঃ

স্ুভাষ রায়—কর্মসচিব

নৃপেন নাগ
অজিত নিয়োগী
দিলীপ ভট্টাচার্য
গুরুদাস লস্কর
দেবকুমার দে
সবিতা মুখোপাধ্যায়, অফিস সম্পাদিকা

নিয়মাবলী

১। মানব-মন ত্রৈমাসিক পত্রিকা। প্রতি বৎসর জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই ও অক্টোবর মাসে ইহা প্রকাশিত হয়।

২। প্রতি সংখ্যার মূল্য ১৲ টাকা। সডাক প্রতি সংখ্যা ১.২০ নয়া পয়সা।
বার্ষিক গ্রাহকগণের ক্ষেত্রে সাডাক ৪৲ টাকা অগ্রিম দেয়। *

৩। চেক্, ড্রাফট, পোষ্টাল অর্ডার, মণি অর্ডার ইত্যাদি PAVLOV INSTITUTE & HOSPITALS এই নামে প্রদেয়

৪। এজেন্সি বা ব্যবসায় সংক্রান্ত শর্তাদির জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ঃ—

স্ুভাষ রায়,—কর্মসচিব
১৩২/১এ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪

সম্পাদকীয়

অন্তরের একান্ত শুভকামনা দিয়ে আজ অভিনন্দন জানাই বিশ্বশান্তি ও সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনকে। এর উদ্যোক্তাদের এ মহতী প্রচেষ্টার জন্য সানন্দ সাধুবাদ। এ আয়োজন সার্থক হোক, সফল হোক এর উদ্দেশ্য, জয় হোক কলুষ-চিন্তা মুক্ত শান্তিকামী মানবমনের। যুদ্ধ নয়। ধ্বংস নয়। নয় সৃষ্টিলোপকারী মারণাস্ত্রের অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা। দানবীয় যুদ্ধ প্রমত্ততা হার মানুক মানবতাবোধের কাছে। বীক্ষণাগারারের স্তূপীকৃত পারমাণবিক অস্ত্রগুলির নিমেষে সলিল সমাধি হোক অতলস্পর্শী আতলান্তিকের গহ্বরে। সমগ্র বিশ্বের জ্ঞানী-গুণী-বিজ্ঞানী. সাহিত্যিক-শিল্পী, গায়ক, চিকিৎসক, দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ অর্থাৎ সকল পর্যায়ের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ শুভচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মস্কোতে মিলিত হয়েছেন শান্তির শ্বেতপতাকার নিচে মানবজাতির সম্মুখস্ত কৃষ্ণযবনিকা চিরতরে সরিয়ে দেবার জন্য। তাঁদের এ মহান প্রয়াস অর্জন করুক চরম সার্থকতা। যুদ্ধোত্তর অবক্ষয়ের গতিমুখ ফিরুক সার্থক সুন্দর সমৃদ্ধ জীবনায়নের পথে।

আজকের সমাজের দিকে তাকিয়ে আমরা দেখতে পাই সমস্যাকীর্ণ জীবনদ্বন্দ্ব নানা সংঘাতে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ আশঙ্কায় বিচলিত, দিশেহারা মানুষের মন। সমগ্র মানবজাতির অস্তিত্ব বিলোপকারী পারমাণবিক অস্ত্রের পুঞ্জিভূত ধোঁয়ায় সমাচ্ছন্ন উদার মহাকাশ। হিরোশিমার প্রান্তরে যে অস্ত্রের ঝনৎকার একদিন মানবসমাজকে বিমূঢ় হতচকিত করেছিল আজ তারই ভয়াবহ অনুরণন ছড়িয়ে পড়েছে সমগ্র বিশ্বে। দুনিয়ার ঘরে ঘরে আজ তাই আতঙ্কের ছায়া। সাধারণ মানুষ ব্যাকুল বিহ্বল। চিন্তানায়কগণ প্রতিবাদে সোচ্চার।

প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ আজকের দিনে আর কেউ চায় না। বিশেষ করে সর্বদেশের অগণিত জনসাধারণ যুদ্ধবিরোধী। দু'টো বিশ্বযুদ্ধের মর্মন্তুদ স্মৃতি জনমানসের সামনে আজও বিভীষিকার কুহেলী বিস্তার করে রেখেছে। মানবমনের ক্রমোন্নতির ধারাবাহিক ইতিকথা আলোচনা করলে আমরা দেখি সহস্র বৎসরের সুদীর্ঘ ক্রান্তিপথ পরিক্রমায় মানুষ সাধ করে কখনও যুদ্ধ করেনি—সেই আদিম পেছিয়ে-থাকা দিনেও। আত্মরক্ষার প্রশ্ন অপরিহার্য না হলে মানুষ অস্ত্র হাতে নেয়নি। যদিও প্রতিক্রিয়াশীল প্রচারে বলা হয় অ-সভ্য মানুষ মাত্রেই হিংস্র বর্বর। আজকের সমাজবিজ্ঞানীরা একথার অসারতা প্রমাণ করেছেন। রাষ্ট্রিক জীবনের বহু ভাল বিষয়ের মধ্যে একটি যে জঘন্য প্রবৃত্তি ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠলো তা হোল শ্রেণী বিশেষের ক্ষমতা লোলুপতা আর যুদ্ধলিপ্সা। তারই ফলশ্রুতি দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ। ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে ছোটখাটো বিভিন্ন যুদ্ধের এবং দুটো বিশ্ব যুদ্ধের। আজকের এই মেগাটন আর নিউট্রন বোমার আবিক্রিয়া দেখে মানবসমাজ কম্পিত চিত্তে ভাবছে বিজ্ঞানের এ কী ভয়ঙ্কর অশুভ সৃষ্টি!

প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন। বিজ্ঞানের গঠনমূলক শক্তি মানব সমাজের মঙ্গলের জন্য নিয়োজিত করার দিন সমাগত। সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের পথে মানবসমাজ বুদ্ধি দিয়ে শ্রম দিয়ে মূল্য দিয়ে যে সংস্কৃত রূপময় জীবনের সন্ধান আজ পেয়েছে—তাকে হানাহানি রেষারেষির পঙ্কিল পথে ঠেলে দিতে শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন কোন মানুষই চাইবে না। জনাতঙ্কগ্রস্ত প্রতিক্রিয়াশীল দার্শনিকের মতে পৃথিবীর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে

রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ছাড়া আর কোন প্রতিকারের পথ নেই। তাঁরা প্রচার করেন, এ পৃথিবীতে জীবন-সংগ্রামে জয়ী উপযুক্তরাই কেবল বেঁচে থাকবেন। তাঁদেরই প্রতিধ্বনি শুনি একদল রাজনীতিবিদের যুদ্ধের হুমকি, ঠাণ্ডা লড়াই আর স্নায়ু যুদ্ধের প্রস্তুতিতে। এ প্রচার মানবমনকে বিভ্রান্ত করে—সত্যের পথে যাত্রা হয় বিলম্বিত। কিন্তু এ প্রচার যে মানবতার পরিপন্থী; সমাজ বিরোধী এবং উদ্দেশ্যমূলক—আজকের মানুষের পক্ষে তা বোঝা মোটেই কঠিন নয়। একচ্ছত্র পুঁজিবাদী মনোভাব যুদ্ধবাদীদের পৃষ্ঠপোষক। এ বিরোধী ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ মানব মনের পুরনো মূল্যবোধকে টিঁকিয়ে রাখতে পারছে না। তাই এ ভাঙনের পাশেই নতুন ভাবাদর্শ নব মূল্যায়নের বনিয়াদ গড়ার কাজ চলছে। সহযোগিতা-ভিত্তিক নতুন মানবিক সম্পর্ক স্থাপনের সাড়া জেগেছে দেশে দেশে। তাই এত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সম্মেলন আর যুদ্ধ বিরোধী মনোভাব।

এ মনোভাবের সূচনায় আমরা দেখতে পাই পাভলভ এবং তাঁর পূর্বসূরী ও উত্তর সাধকদের। তাঁদের কাছে আমরা বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করেছি। বৈজ্ঞানিক জীবন দর্শনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছি। আমরা জেনেছি বিজ্ঞান আর সব কিছু বদলে ফেলে সমস্ত অপূর্ণতা দূর করে নতুন দুনিয়া প্রাচুর্যের পৃথিবী গড়তে পারে। পারমাণবিক বিদ্যার দৌলতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ আজ সমৃদ্ধ। যান্ত্রিক স্বয়ংক্রিয়তা প্রয়োগে মানুষের কায়িক ও বৌদ্ধিক শ্রম লঘুকৃত। বিজ্ঞান আজ স্বার্থান্বেষীর কবলমুক্ত ও সুপ্রযোজিত হ'লে মানুষের সব অভাব অনটন দূর করে তাকে নীরোগ দীর্ঘায়ু করা সম্ভব। দুশ্চিন্তামুক্ত প্রচুর অবসর আর অবকাশ পাওয়া যাবে সংস্কৃতিমূলক চিত্ত সমৃদ্ধকারী বৈচিত্র্যপূর্ণ নিত্য নব কাজে লিপ্ত হবার। যুদ্ধের অস্ত্রসজ্জায় নিয়োজিত অর্থের সুপরিকল্পিত বিনিয়োগে পৃথিবীর অনশন অর্ধাশনের সমস্যা কয়েক বছরের মধ্যেই দূর হতে পারে। এ কথা আজ আদর্শবাদীর স্বপ্ন বিলাস নয়। এ সমস্যার সমাধান হতে পারে স্বার্থ-সংঘাত কলহ-বিদ্বেষমুক্ত মনে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে লড়াইকে সম্পূর্ণ দূর করে দিলে।

যুদ্ধ অনেক হয়েছে—যুদ্ধের শেষে প্রতিবারই কূটনীতিজ্ঞরা একজোট হয়ে স্থির করেছেন ভবিষ্যতে আর এমন প্রাণঘাতী যুদ্ধ করবেন না। কিন্তু এ ক্ষণস্থায়ী অঙ্গিকার স্ফুলিঙ্গের মত উড়ে গেছে পরবর্তী যুদ্ধের বোমা বিস্ফোরণে। ভিয়েনা কংগ্রেস, জাতিসঙ্ঘ এমনি ধারা নিরস্ত্রীকরণ ও যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব করেছে। কিন্তু আবার যুদ্ধ হয়েছে। একটি বৃহৎ শক্তি সমগ্র বিশ্বের অধিকর্তা হবে। অন্তরায় স্বরূপ ছোটখাটো শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলিকে ধ্বংস করতেই হবে। একদল মানুষ সব সময়ই এর বিরোধিতা করেছে। কোরিয়া-কাটাঙ্গা আলজেরিয়ার ঘটনা তাঁদের ব্যথিত করে।

সাধারণ ও পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব সর্ব প্রথম সোভিয়েট দেশ পেশ করেছিল ১৯২৭ সালে জেনেভা বৈঠকে।

সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। গত যুদ্ধের পর আবার এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা সুরু হয়। পৃথিবীর রাজনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য নিরস্ত্রীকরণ ও শান্তি সম্মেলন বারবার ব্যর্থ হয়েছে। সে ব্যর্থতার আজ পূর্ণ অবসান ঘটুক। দুনিয়ার মানুষ শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের প্রস্তাবে একমত হয়ে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের রাখী বন্ধন করুক।

ইউনেস্কো ও জাতিসংঘের অন্যান্য সম্পূরক প্রতিষ্ঠানগুলি আংশিকভাবে বিশ্ব-কল্যাণে নিয়োজিত। পারমাণবিক যুদ্ধের ভীতি মানুষের সঙ্গে মানুষের একাত্মবোধকে এক নতুন স্তরে উন্নীত করেছে। এতে আছেন ধনিক ও শ্রমিক শ্রেণী, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী ও সাহিত্যিক। এ আন্দোলনে যোগ দিয়েছে বৃটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা,

সোভিয়েৎ ইউনিয়ন, চীন, ভারত ও আফ্রিকার বহু মনীষী—যাঁদের মধ্যে কোন রাজনৈতিক স্বার্থসম্পর্ক বা শ্রেণীগত ঐক্য নেই। বিজ্ঞানীদের একটি বিশ্বসংস্থাও পারমাণবিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে কাজ চালাচ্ছেন। পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জার বিরুদ্ধে লর্ড রাসেল পরিচালিত ইংল্যাণ্ডের আধুনিক আন্দোলন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এ আন্দোলনগুলো মূলতঃ যুদ্ধ ও একচ্ছত্র পুঁজিবাদবিরোধী হলেও শুধু অর্থনৈতিক কারণ এর পেছনে নেই। কেবল মাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেও নয়—জীবনবোধের তাগিদে এঁরা একত্র হয়েছেন। মানবজাতির মুক্তি আন্দোলনকারীগণ বিশ্বাস করেন আজকের দিনে বাঁচতে হলে নিষ্ঠুর না হলেও চলে, হিংস্র না হলেও চলে। মানুষে মানুষে শত্রুতা আর প্রতিযোগিতা নয়—সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ককে ধ্রুপদী মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আমরা আশা রাখি…"মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মোহমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ আরম্ভ হবে…আর এক দিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে।"

"উৎসারিত নব জীবন নির্ঝর, উচ্ছ্বসিত আশা গীতি
অমৃত পুষ্পগন্ধ বহে আজি এই শান্তি পবনে—"

বিশ্ব শান্তি অক্ষয় হোক।

* * * *

আমরা অত্যন্ত গর্ব বোধ করছি কারণ মানব-মনের সম্পাদক ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং উপদেষ্টা মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ডাঃ জ্যোতির্ময় শর্মা এই বিশ্বশান্তি ও নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে মস্কো গেছেন। সম্মেলন শেষে তাঁরা ওখানকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গবেষণাগার এবং পাভলভ গবেষণাগার পরিদর্শন করবেন। তাঁরা (১৯৬২) আগষ্টের প্রথম সপ্তাহে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবেন। মানব সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য সোবিয়েত ইউনিয়ন এবং বিশেষ করে সেখানকার পাভলভ গবেষণাগার যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে তার অভিজ্ঞতা এবং পদ্ধতিগুলি আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে প্রসার করবার ব্যাপারে তাঁদের এই সফর বিশেষভাবে সাহায্য করবে এই আশা আমরা রাখি।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যুতে মানব-মনের পক্ষ থেকে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করছি।

সুখ্যাত শিল্পী ছবি বিশ্বাসের দুর্ঘটনা-জনিত মৃত্যুতে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করছি।

ইয়ার্‌ক্‌স্‌ ও কোয়েলারের চিন্তাধারা সম্পর্কে

আই, পি, পাভলভ

আমাদের সামনে র‍্যাফেল নামে শিম্পাঞ্জীটি রয়েছে। আপনি যদি একে বলেন 'কাজ শুরু কর', তবে সে একটি বৃহৎ আয়তাকার বাক্সের পাশে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে বসবে। এই বাক্সটি অপসরণীয় ডালাবিশিষ্ট। প্রত্যেকটি ডালার উন্মুক্ত করার ছিদ্র পথ ভিন্ন আকৃতির, যেমন গোল, চতুষ্কোণ ও ত্রিকোণাকার। নিম্নাংশে ছোট একটি দরজা আছে এবং এর মধ্যেই আমরা র‍্যাফেলের আগ্রহ উৎপাদনকারী খাদ্য রাখি। বাক্সটির পাশে আমরা পনের থেকে কুড়িটি লাঠি রেখে দেই; এগুলিও নানা আকৃতির—গোল, চতুষ্কোণ ও ত্রিকোণাকার। র‍্যাফেলের সামনেই আমরা বাক্সটির নিম্নাংশে খাদ্য রেখে বন্ধ করে দিলাম। বাক্সটির গঠন বিশেষ ধরনের। শুধুমাত্র ডালাটির ছিদ্রপথানুরূপ আকারের একটি লাঠি ঐ ছিদ্রপথে প্রবেশ করানর পর সজোরে চাপ দিলেই নিম্নাংশের দরজাটি উন্মুক্ত হয় এবং তখনই র‍্যাফেলের পক্ষে ঐ খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব। একেই আমরা তার 'কাজ' বলি এবং একাজ দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে, দু'তিন মাস বা তারও বেশী। আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য র‍্যাফেলের সামনেই বাক্সটির মধ্যে খাদ্য ও পাশে এক আটি লাঠি রাখা হয়। এই লাঠিগুলির কোনটি গোল, কোনটি চতুষ্কোণাকৃতি, কোনটি বা ত্রিকোণাকার। বর্তমানে র‍্যাফেল তার কাজ বেশ দক্ষতার সংগে সম্পন্ন করতে পারে। যেমন ধরুন, বাক্সটির উপরে চতুষ্কোণ ছিদ্রবিশিষ্ট ডালা রেখে দিলে সে এমন একটি লাঠি বেছে নেবে যার অগ্রভাগ চতুষ্কোণাকৃতি এবং বাক্সটি উন্মুক্ত করবে।

অনেকগুলি লাঠির সংগে শুধুমাত্র একটি চতুষ্কোণ লাঠি রেখে আমরা যখন তার কাজটি জটিল করে তুলি তখন সে ভুল করে চতুষ্কোণ লাঠির পরিবর্তে একটি ত্রিকোণাকৃতি লাঠি বেছে নেয়। পরপর তিনবার এই একই ভুল করার পর চতুর্থবার সে সঠিক লাঠিটি বেছে নেয়। পরীক্ষাটি আবার করা হল। এবার কিন্তু র‍্যাফেল ভুলটি দুবার করল এবং তৃতীয়বার সঠিক লাঠিটি বেছে নিল। এভাবে পরীক্ষা ও ভুল কয়েকবার করার পর অনুরূপ ক্ষেত্রে চতুষ্কোণ লাঠিটি আটির ভিতরে লুকিয়ে রাখলেও সেটিকে খুঁজে না পাওয়া পর্য্যন্ত সে নিরস্ত হয় না। সুতরাং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে র‍্যাফেল ভুল করে বটে, কিন্তু তার ভুলের ধারণাটি সব সময় একই। তার সামনে গোল বা ত্রিকোণাকৃতি অনেক লাঠি থাকা সত্ত্বেও সে কখনো একটি গোল লাঠি বেছে নেয় না।

পরে আমরা ডালাটি পরিবর্তন করে গোল ছিদ্রবিশিষ্ট একটি ডালা বাক্সটির উপরে রাখলাম। র‍্যাফেলের নির্বাচনটি এবার চমৎকার হল। আটির ভিতরে রাখা সত্ত্বেও তৎক্ষণাৎ সে সঠিক লাঠিটি বেছে নিল। ডালাটি আবার আমরা পরিবর্তন করলাম। এবার ওর ছিদ্রপথটি ত্রিকোণাকার নয়, গোলাকার। প্রথমবার র‍্যাফেল একে চতুষ্কোণ ছিদ্র বলে ভুল করে অর্থাৎ তখনো সে বিভিন্ন কৌণিক আকৃতির সঠিক পার্থক্য নির্ণয়ে অক্ষম। সে একটি চতুষ্কোণ লাঠি বেছে নেয় এবং সেটিকে ছিদ্রপথে প্রবেশ করাতে চেষ্টা করে।

কিন্তু সফল না হওয়ায় সেটিকে সে ছুড়ে ফেলে দেয়। কিন্তু এই একই ভুল সে দুবার করে না। অন্য লাঠিগুলির মধ্যে যেভাবেই লুকিয়ে রাখা হোক না কেন ত্রিকোণ লাঠিটিকে সে খুঁজে নেবেই। এ সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনা করব। এখানে আমি কিঞ্চিৎ কল্পনার আশ্রয় নেব, অবশ্য সম্পূর্ণ যুক্তিসংগতভাবেই। র‍্যাফেল অত্যন্ত ভোজনপ্রিয়। শুধুমাত্র উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের বিনিময়েই সে সমগ্র প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করে। ছোটখাট ব্যাপারে সময় নষ্ট করতে সে একেবারেই নারাজ। 'রোজা' র‍্যাফেলের মত আর একটি শিম্পাঞ্জী। এই স্ত্রী শিম্পাঞ্জীটি র‍্যাফেলের মত উদরপূর্তির দিকে নজর রাখা অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিচালনা করতে বেশী পছন্দ করে। খাদ্য দিলে সে প্রায়ই দূরে সরিয়ে দেয়। এ ধরনের পরীক্ষায় তার আগ্রহ দেখা গেলে আমরা একথা বলতে পারি যে খুব সম্ভবতঃ কৌতূহল মেটাবার জন্যই সে কাজটি সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে।

এখানে আমি একটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে চাই। ইয়ারকিস্ ও কোয়েলার যে শিম্পাঞ্জীটির কার্যকলাপ উচ্ছ্বসিতভাবে বর্ণনা করেছেন তা অপেক্ষা এই শিম্পাঞ্জীটির কার্যকলাপ কোন অংশেই ন্যূন নয়। তাঁরা এ ধরনের কার্যকলাপকে বানর-প্রজাতির বিশেষ বুদ্ধির প্রকাশ বলে মনে করেন। কুকুরের কার্যকলাপকে তারা অনুষংগ পদ্ধতিনির্ভর মনে করেন এবং এ দুয়ের মধ্যে তার এক সুনির্দিষ্ট ভেদরেখা কল্পনা করেন। কিন্তু এ ধরনের ধারণার সপক্ষে তাদের যুক্তি কি? এক্ষেত্রে কুকুর ও শিম্পাঞ্জীর পার্থক্য কোথায়? এ প্রশ্নটিও আমি করব যে এই কার্যকলাপ ও একটি শিশুর কার্যকলাপের মধ্যে প্রভেদ কি? অথবা কিভাবে তা কুকুরের কার্যকলাপ থেকে স্বতন্ত্র?

শিম্পাঞ্জীরা হাত এবং পা দুইই সমানভাবে ব্যবহারে সক্ষম—এই হল মৌল পার্থক্য। এর ফলেই তার পক্ষে কাজটি অপেক্ষাকৃত সহজভাবে করা সম্ভব, যেমন সঠিক লাঠিগুলি নির্বাচন করা, তা থেকে একটি বেছে নেয়া ও ছিদ্রপথে প্রবিষ্ট করান ইত্যাদি। কুকুরের তুলনায় অংগপ্রত্যংগ পরিচালন ক্ষমতা অধিকতর উন্নত হওয়াই র‍্যাফেলের সফলতার সর্বাপেক্ষা বড় কারণ। কিন্তু কুকুরের হাত নেই; নির্বাচন, ধারণ ও স্থাপন প্রভৃতি কাজে সক্ষম এরূপ পাঁচটি পৃথক অংশসমন্বিত সঞ্চালনশীল কোন অংগ তার নেই। এর অর্থ হলো, কুকুর অপেক্ষা শিম্পাঞ্জীর চেষ্টাবহা প্রত্যংগ উন্নততর।

শিম্পাঞ্জী হাতের অধিকারী হওয়ায় ও তার সাধারণ আচরণে মানুষের সংগে যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকায় দর্শক প্রভাবিত হয়। যাহোক, পরিবেশের সংগে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এক জটিল স্থিতিসাম্য অর্জনের পূর্বে র‍্যাফেলের সমগ্র কার্যক্রম পর্যালোচনা করে বলা চলে যে যেখানেই আমরা তার আচরণ পুংখানুপুংখরূপে লক্ষ্য করার সুযোগ পেয়েছি সেখানেই দেখেছি যে পরীক্ষা নিরীক্ষার সময় কুকুরের ক্ষেত্রে লক্ষিত হয়নি এরূপ কোন কিছুই তার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে অবর্তমান।

এ হল বিশ্লেষণী অংগসমূহ ও নিস্তেজনা-ক্রিয়া নির্ধারিত এক অনুষংগ ও বিশ্লেষণপদ্ধতি। এই নিস্তেজনা-ক্রিয়া কোন নির্দিষ্ট পরিবেশে যা কিছু অপ্রয়োজনীয় তার বিষমীকরণ ও বর্জনে সহায়তা করে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় এর বেশী কোন কিছু আমাদের দৃষ্টি গোচর হয়নি। সুতরাং শিম্পাঞ্জীর 'বুদ্ধি' আছে, তা মানুষের সংগে তার ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক সূচিত করে এবং কুকুরের বুদ্ধি নেই, তারা শুধু মাত্র অনুষংগ পদ্ধতি সৃষ্টিতে সক্ষম এরূপ দাবীর কোন ভিত্তি নেই। কয়েকজন মনোবিদ সম্পর্কে আমার পূর্বতন বিরাগ ফিরে এসেছে। প্রথমে বর্জন করলেও পরে তাদের সংগে কিছুটা সামঞ্জস্য বিধানে আমি সক্ষম

হয়েছিলাম। কিন্তু তথ্যসমূহ বর্তমানে আমাকে তাদের বিরুদ্ধবাদী হতে বাধ্য করেছে। মনে হয় তাঁরা বিষয়টিকে অব্যাখ্যাত রাখতে চান। সত্যই কি বিচিত্র! রহস্যময়তা তাঁরা কতই না ভালবাসেন! শারীরবৃত্তমূলক ব্যাখ্যা সম্ভব এরূপ সব কিছুই তাঁরা বর্জন করে চলেন। কিন্তু এখানে বর্ণিত সকল তথ্যই আমাদের চোখের সামনে ঘটেছে। বাক্সটি নিয়ে ক্রমে ক্রমে ও দীর্ঘদিন ধরে র‍্যাফেলকে যে কাজগুলি সম্পন্ন করতে হয়েছিল তা সে বিশ্লেষণ করেছিল। প্রথমে সে মেঝেতে আড়াআড়িভাবে রক্ষিত লাঠিগুলির আকৃতি চিনতে শুরু করে; সে গোল, ত্রিকোণ ও চতুষ্কোণাকৃতি লাঠিগুলির পার্থক্য নির্ণয় করতে শেখে। সঠিক লাঠিটি বেছে নেবার সময় তার প্রথম অভিব্যক্তি হল এক বিশৃংখল প্রতিক্রিয়া। মনে হয় এ সম্পর্কে আমি পূর্বেই বলেছিযে আমরা যদি বাস্তবার্থজ্ঞাপক শব্দ প্রয়োগ করতে চাই তবে 'ট্রায়েল এ্যাণ্ড এরর' এই মার্কিন কথাটির পরিবর্তে 'বিশৃংখল প্রতিক্রিয়া' কথাটি গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রথমটি আত্মবাদী মত প্রকাশ করে। কিন্তু বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এটি 'বিশৃংখল প্রতিক্রিয়া'। উদাহরণ স্বরূপ ইনফুসোরিয়ার কথা ধরা যাক। ইনফুসোরিয়া নিজের বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বিচরণক্ষেত্রে ইতঃস্তত সঞ্চরণ করে—যেমন খাদ্যসংগ্রহ, অনুকূল পরিবেশ, অধিকতর উত্তাপ, অক্সিজেন এবং আরও নানা প্রয়োজনে যার হদিস কেউ জানে না। হঠাৎ তাদের একটি কোন ক্ষতিকর বস্তুর যেমন শীতল বা উষ্ণ স্রোতের সংস্পর্শে এলে এঁকেবেঁকে সামনে-পিছনে, এপাশে-ওপাশে চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না অনুকূল বিচরণ ক্ষেত্রের সন্ধান পায়, একে বলা হয় 'ট্রায়েল এ্যাণ্ড এরর' পদ্ধতি। কিন্তু আমি একে 'বিশৃংখল প্রতিক্রিয়া' বলাই সংগত মনে করি। শুরুতে মানবশিশুর প্রতিক্রিয়াও শৃংখলাহীন এবং একে 'বিশৃংখল প্রতিক্রিয়া' বলাই আমি সমীচিন মনে করি।

কোন কাজে লাঠিকে ব্যবহার করতে র‍্যাফেল সম্ভবতঃ অনেক আগেই শিখেছিল। তার লাঠি তুলে নেয়ার অর্থ সহজেই বুঝতে পারা যায়, কারণ তার সামনেই এটিকে পূর্বে ছিদ্রপথে প্রবিষ্ট করান হয়েছিল। এখানে আমরা অনুকরণমূলক উদ্দীপনার সাক্ষাৎ পাই। সে লাঠিটিকে প্রবেশ করাতে চেষ্টা করে, কিন্তু সক্ষম হয় না। খাদ্যলাভ তার প্রচেষ্টাকে সঞ্জীবিত না করায় সে ঐ লাঠিটি বাতিল করে অন্য একটি গ্রহণ করে। সেটিও অবশ্য পরিত্যক্ত হয়। যা হোক, শেষে সে বিভিন্ন লাঠির পার্থক্য বুঝতে শেখে। কয়েকবার ব্যর্থতার পর আর সে ভুল লাঠিটি নির্বাচন করে না। এর অর্থ হল, এ সম্পর্কে বিলুপ্তিমূলক নিস্তেজনার (extinctive inhibition) সৃষ্টি হয়েছে। তার তৃতীয়বারের চেষ্টা সফল হল; খাদ্যবস্তু সে পেল এবং এভাবে তার প্রচেষ্টা খাদ্যলাভে সঞ্জীবিত হল। কয়েকবার পুনরাবৃত্তির পর লাঠিটির দৃশ্যমান প্রতিরূপ ও প্রচেষ্টার সফলতা সংযোজিত হল। কিন্তু বাক্সের ডালাটি আবার পরিবর্তন করা হল। যে লাঠিটি ইতিপূর্বে সফলতা এনেছে সেটিকেই র‍্যাফেল বেছে নিতে চাইবে। কিন্তু এবার সেটির ব্যবহার খাদ্যলাভে সঞ্জীবিত হল না। সে বিষমীকরণে সক্ষম হল, ঐ লাঠিটি পরিত্যক্ত হল এবং একই ভাবে অন্য একটি লাঠি তুলে নিল।

ফলতঃ সবকিছুই শুরু হয় অনুষংগ থেকে, লাঠিগুলির আকার বিশ্লেষণ থেকে। পরবর্তী পরীক্ষার সময় সে খুশীমত লাঠি তুলে নেয়, কারণ ডালাটির ছিদ্রমুখের সংগে সে ও-গুলির সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারে না। কিন্তু ছিদ্রপথানুরূপ না হলেই নির্বাচিত লাঠিটিকে সে ছুড়ে ফেলে দেয় এবং এভাবেই বিলুপ্তির সৃষ্টি হয়। সে আরেকটি লাঠি নিয়ে চেষ্টা করে এবং ছিদ্রানুরূপ না হলে এবারও সেটিকে বাতিল করে। অবশেষে সে

সঠিক লাঠিটির সন্ধান পায়। এরূপে সে অনায়াসেই দুটি লাঠির স্বাতন্ত্র্য নির্ণয় করতে পারে, যদিও তা সমস্যাটির সমাধানের পক্ষে যথেষ্ট নয়। এখন পর্যন্ত র‍্যাফেল শুধুমাত্র লাঠিগুলির আকার বিশ্লেষণে সক্ষম, কিন্তু ছিদ্রপথের সংগে তাদের সম্পর্ক নির্ণয়ে অপারগ। তারপর দ্বিতীয় পর্ব—লাঠিগুলি ও ছিদ্রপথের আকারের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় শুরু হল। স্পষ্টতই র‍্যাফেল দীর্ঘকাল লাঠিগুলি ও ছিদ্রপথের আকারকে সংযোজিত করতে সক্ষম হয়নি কারণ গোল, চতুষ্কোণ বা ত্রিকোণাকৃতি ছিদ্রপথ বিশিষ্ট ডালা উন্মুক্ত হতে দেখলেও তখনো সে লাঠিগুলির বিশেষ আকৃতি দেখতে পাচ্ছিল না।

কিন্তু লাঠি ও ছিদ্রপথের মধ্যে আকারগত অনুষংগ সৃষ্টি একান্ত প্রয়োজন। যখন অনুরূপ কোন অনুষংগ ফলপ্রদ হয়, যখন খাদ্যপ্রাপ্তি তাকে সঞ্জীবিত করে তখনি র‍্যাফেল ছিদ্রপথ ও লাঠিগুলির আকার দর্শন-ক্ষেত্রে যে দুটি উদ্দীপনা সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে। অর্থাৎ সে বিশ্লেষণ শুরু করে। একটা সময় আসে যখন সে গোল ও বিভিন্ন কৌণিকাকৃতি ছিদ্রপথের প্রভেদ নির্ণয়ে সক্ষম হয়। কিন্তু তখনো সে বিভিন্ন কোণিকাকৃতি পরস্পরের পার্থক্য নির্ণয়ে অসমর্থ থাকে। এ থেকে বুঝতে পারা যায় যে তার বিশ্লেষণ-ক্রিয়া উন্নততর হওয়া প্রয়োজন। অবশেষে র‍্যাফেল লাঠিগুলির পার্থক্য সঠিকভাবে বুঝতে পারে এবং সমস্যাটির পূর্ণ সমাধান হয়।

ফলতঃ এই কাজটিতে শুধুমাত্র ছিদ্রপথ ও লাঠি সম্পর্কিত অবিচ্ছিন্ন অনুষংগ বর্তমান। এখানেই র‍্যাফেলের মানবসুলভ কার্য্যকলাপের সবকিছু তার সমগ্র আচরণ বিশ্লেষণ ও অনুসংগের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।

এম, এ, উস্‌ইভিচ্‌ ঃ আমার পরীক্ষাধীন কুকুরটিকে প্রথমদিন পরীক্ষামঞ্চে স্থাপন করার পরই সে ঘূর্ণ্যমান খাদ্য-পাত্রটিকে দেখতে পেয়ে থাবার সাহায্যে আবর্তিত করতে শুরু করেছিল।

আই, পি, পাভলভ ঃ আমি যা বললাম তার সংগে এর সম্পূর্ণ মিল রয়েছে। অনুষংগ পদ্ধতিকে ভিত্তি করে কুকুর ও বানর-প্রজাতির মানসিকতার প্রভেদ কল্পনা করার প্রবণতা হল সমস্যাটিকে এড়িয়ে গিয়ে তাকে রহস্যময় ও অসাধারণ প্রতিপন্ন করার জন্য মনোবিদদের প্রচ্ছন্ন ইচ্ছা থেকে উদ্ভূত। সত্য থেকে বিচলিত হবার এই ক্ষতিকর ও ঘৃণ্য প্রবণতা থেকেই ইয়ারক্‌স্‌ ও কোয়েলারের ন্যায় মনোবিদগণ নানা বন্ধ্যা ধারণাকে আকড়ে ধরেছেন—যেমন শিম্পাঞ্জিটি মানুষের মত 'অবসর সময়ে গভীর চিন্তামগ্ন হল' অথবা 'একটি সমাধান আবিষ্কার করল' ইত্যাদি। অবশ্য এ হল অর্থহীন, শিশুসুলভ ও অসংগত উক্তি। আমাদের এরকম ঘটনার সংগে বিশেষভাবেই পরিচয় আছে—একটি কুকুর কোন নির্দিষ্ট কাজ করবার চেষ্টা করেও সম্পন্ন করতে পারছে না; ধরুন, দুদিনের জন্য তাকে বিশ্রাম দেয়া হল এবং তারপর সে কাজটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হল। এখানে সত্যাই কি আমরা বলতে পারি যে কুকুরটি ঐ দুদিন সমস্যাটি সমাধানের উপায় চিন্তা করছিল? অবশ্যই পারি না। নিস্তেজনা নেমে এসেছিল শুধুমাত্র ক্লান্তির জন্য এবং এই ক্লান্তিই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, সবকিছু দুরূহ করে তোলে ও ধ্বংস করে। এ অতি সাধারণ ঘটনা।

বহুদিন পূর্বে কোন একজন, সম্ভবতঃ স্পারেনেস্কি, আমাকে বলেছিলেন যে নতুন সংগীত অনুশীলনের সময় প্রায়ই সুরকার যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হন, তাদের চেষ্টা সার্থক হয় না। যত বেশী চেষ্টা করা যায় ততই যেন জটিলতা বৃদ্ধি পায়। গভীর হতাশায় তাঁরা চেষ্টা করা ছেড়ে দেন। কিন্তু কিছুকাল পর

আবার শুরু করে তাঁরা অনায়াসেই বাধাবিঘ্নগুলি অতিক্রমে সক্ষম হন। এর ব্যখ্যা হল, অনুশীলনের ফলে তাঁরা ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং এই ক্লান্তিই দ্রুত সফলতার পথে বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু কিছুকাল বিশ্রামের পর সফলতা অনায়াসলভ্য হয়।

এখানে বলা প্রয়োজন যে এই ঘটনাগুলি সহজেই ব্যখ্যা করা চলে। স্মরণ রাখা দরকার যে ধারাবাহিকভাবে পরীক্ষা চালাবার সময় র‍্যাফেলের ভুল আরো ঘন ঘন হত। তার হতাশভাব দেখা দিত এবং বিভ্রান্ত মানুষের মত সে একটির পর একটি লাঠি তুলত। এটা স্পষ্টতই ক্লান্তির লক্ষণ।

এরপর নিম্নরূপ ঘটনাটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কাজে অক্ষম হলে র‍্যাফেল কিছু সময়ের জন্য অন্যদিকে তাকিয়ে থাকত, পরে ফিরে আবার চেষ্টা করত। এই ঘটনাটিও অতি সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। কার্য্যরত অবস্থায় র‍্যাফেলের চোখের সামনে থাকত লাঠিগুলির দৃশ্যমান প্রতিরূপ, কিন্তু যখন সে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিত তখন নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রতিভাত হত লাঠির বিভিন্ন আকার। এমনিভাবে অনুষংগ সহজেই গড়ে উঠত। এও অতি স্বাভাবিক। প্রকৃত পক্ষে বিষয়টির ব্যাখ্যা এইভাবেই করা উচিত।

শিম্পাঞ্জীসম্পর্কিত গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে চাই যে তাদের জটিল আচরণ অনুষংগ ও বিশ্লেষণের যুক্ত ফল এবং একেই আমি উচ্চতর স্নায়ু প্রক্রিয়ার ভিত্তি মনে করি। এখনো তার আচরণে এর বেশী কিছুই আমরা দেখতে পাইনি। আমাদের চিন্তাধারা সম্পর্কেও এই একই কথা প্রযোজ্য। এখানেও অনুষংগের অতীত কিছুই নেই।

অনুবাদক ঃ পরিতোষ গুপ্ত

উপজাতিদের সঙ্ঘচেতনা

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

ভারতের উপজাতি সমস্যা আজ প্রগতিশীল সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে অধ্যয়ন এবং প্রয়োগের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসাবে স্বীকৃতির দাবী জানাচ্ছে। উপজাতিদের জীবন আর নিছক নৃ-তাত্ত্বিক গবেষণার বিষয় হয়ে নেই। আমাদের দেশের সংবিধানে উপজাতি কল্যাণকে রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কর্তব্য বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে উপজাতিগুলির মধ্যে অনেকেই স্বাধীন ভারতে নিজেদের অধিকার এবং স্বাতন্ত্র্যের দাবীতে মুখর হয়ে উঠেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়ত সে দাবী বিভেদ এবং বিচ্ছিন্নতার মনোভাব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু তার দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়ে সমগ্র সমস্যাটিকে জাতীয় ঐক্য এবং সংহতির দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করা প্রয়োজন।*

উপজাতিদের উন্নয়ন পরিকল্পনার যে লক্ষ্য রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এবং ঘোষিত হয়েছে তা হ'ল যত দ্রুত তারা বহু বহু শতাব্দীর অনগ্রসরতা এবং বর্তমানের নানা বিপর্যয় ও দুঃখদুর্দশা অতিক্রম করে ভারতের জনগণের অন্যান্য অংশের সাথে সমান মর্যাদা ও অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তার ব্যবস্থা। জাতীয় জীবনে উপজাতিদের স্থান কি হবে? এই প্রশ্নের জবাবে সরকারী নীতি হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে যে, তারা যাতে স্বকীয় সত্তা, ভাষা ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রেখে জাতীয় জীবনের সমান অংশীদারে পরিণত হতে পারে তাই হবে উদ্দেশ্য। আবার ভারতের সমস্ত জনসমষ্টির মধ্যে ঐক্যের যে নিবিড় যোগসূত্রগুলি আছে সেগুলি যাতে উপজাতিদের জীবন ও চেতনায় স্থায়ীভাবে প্রবেশ করতে পারে তারও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। মোট কথা, উপজাতিগুলি যাতে তাদের সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে যা কিছু ভাল এবং জীবন্ত তাকে এগিয়ে নিয়ে বিকাশ লাভ করতে পারে আর ভারতীয় ঐক্যের মূল সুরে অবদান দিতে পারে—তার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

উপজাতিগুলি অনেক পিছনে পড়ে আছে ঠিকই। তাই বলে তাদের জীবনে সব কিছুই পশ্চাৎপদ ও বর্জনযোগ্য মনে করার কোনো কারণ নেই। যাঁরা দরদী দৃষ্টি নিয়ে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন তাঁদের সকলেই উপজাতি-জীবনের যে দিকগুলিকে শ্রদ্ধা না করে পারেন না সেগুলি হল যথাক্রমে (১) তাদের সরল উদার মানবিকতা (২) বলিষ্ঠ মর্যাদাবোধ (৩) শক্তিশালী সঙ্ঘচেতনা। এই সঙ্ঘচেতনারই অপরূপ অভিব্যক্তি দেখা যায় তাদের সংস্কৃতির যা শ্রেষ্ঠ সম্পদ সেই লোককথায়। (৪) সমাজের আদিম হলেও গণতান্ত্রিক প্রকৃতি।

উপজাতি সমাজের গণতান্ত্রিক প্রকৃতি এবং সঙ্ঘচেতনার ভিত্তি হল তাদের যৌথ অর্থনীতি এবং তারই উপরে গড়ে-ওঠা জীবনযাত্রা প্রণালী। যে সব উপজাতি সমাজ বিকাশের দিক থেকে একেবারে আদিম বা প্রায় আদিম স্তরে পড়ে আছে তারা প্রধানতঃ সমবেত জীবন যাপন করে। এই ধরনের উপজাতিরা হয় খাদ্য সংগ্রাহক অর্থাৎ শিকার ও সংগ্রহের দ্বারা জীবিকার চাহিদা পূরণ করে নতুবা আদিম ধরনের কৃষিজীবী। এদের অস্থায়ী বাসস্থানে বা যেক্ষেত্রে এরা কোন এক স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাসে অভ্যস্ত হয়েছে

সেখানে এদের গ্রামের বিন্যাসেই যৌথ প্রকৃতির চরিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠে। কুটিরগুলি হয় একটি কেন্দ্রের বৃত্তকে অবলম্বন করে নতুবা একটি সরল পথের দুপাশে স্থাপিত হয়। এদের মধ্যে শিকারের এবং আত্মরক্ষার হাতিয়ার, পরিধেয় এইরকম দুই একটি জিনিসের উপরে ছাড়া ব্যক্তিগত সম্পত্তির চলন হয় নি। শিকার ও সংগ্রহ এবং যে সব ক্ষেত্রে আদিম ধরনের কৃষির প্রচলন হয়েছে সেখানে সংগৃহীত খাদ্যপদার্থ বা উৎপন্ন ফসলের উপর পরিবারগুলির সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত। কিন্তু বন ও চাষের ক্ষেত্র হল সমগ্র সমাজের সম্পত্তি। প্রত্যেক বৎসর এক একটি পরিবারকে নতুনভাবে ক্ষেত্র বিলি করা হয়। যদি কোনো বৎসর কারুর ফসল ভাল না হয় তবে পরের বৎসর জমি বন্টনের সময় সেই পরিবারকে সব চাইতে ভাল জমি দেওয়া হয়। এই ধরনের অনেক উপজাতিদের গ্রামে ফসলের যৌথ গোলার অস্তিত্ব দেখা যায়। যে সব পরিবারে কর্মক্ষম পুরুষ নেই বা যারা নানা কারণে খুব দুঃস্থ হয়ে পড়ে তাদের ঐ সব যৌথ গোলা থেকে সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে।

যে সব উপজাতি যাযাবর বা অর্ধ যাযাবর এবং পশুপালকের জীবন যাপন করে সেসব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন পশুপালের উপর সম্পত্তির অধিকার থাকা সত্ত্বেও পশুচারণের কাজ হয় একই সাথে।

যেসব উপজাতি দীর্ঘকাল পূর্বে থেকে স্থায়ী কৃষিজীবীতে পরিণত হয়েছে তাদের মধ্যে সমাজের যৌথ প্রকৃতিতে অনেক ভাঙ্গন ধরেছে ঠিকই। তবু সেই আদিম যৌথ জীবনের অবশেষগুলি এখনও এদের সমাজে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। চাষের জমি সম্পূর্ণভাবে পারিবারিক সম্পত্তিতে পরিণত হলেও তা হস্তান্তরের ব্যাপারে সমাজের সুনির্দিষ্ট বিধিনিষেধ আছে। বন গোটা সমাজের সম্পত্তি। আর গ্রামের চাষ-যোগ্য জমির কিছু অংশ সমবেত সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হয়। তা ব্যবহৃত হয় গ্রামদেবতার পূজা ও পুরোহিত প্রভৃতির ভরণপোষণের উদ্দেশ্যে।

অনেকগুলি উপজাতির মধ্যে অবিবাহিত যুবক ও বালকদের জন্য যৌথ শয়নগৃহের প্রচলন দেখা যায়। এগুলি উপজাতি সমাজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ করে অর্থাৎ যুবক ও বালকেরা সামাজিক কর্তব্য সম্বন্ধে এখানে শিক্ষালাভ করে।

উপজাতিগুলির মধ্যে যারা আদিম বা প্রায় আদিম স্তরে পড়ে আছে সেখানে সামাজিক ভেদাভেদের লেশ মাত্র নেই। নারী ও পুরুষ হিসাবে কিছু কিছু শ্রমবিভাগ এবং দুই একটি হস্তশিল্পে কেউ কেউ বিশেষ দক্ষতালাভ ছাড়া অন্য কোন রকম তারতম্য বিশেষ গড়ে ওঠে নি। গ্রাম বা সমাজের প্রধান ও পুরোহিত প্রভৃতি কর্মকর্তার কিছু কিছু বিশেষ সামাজিক ভূমিকা এবং ক্ষমতা থাকলেও সমাজের অন্যান্যদের তুলনায় তারা কোন বিশেষ সুবিধা বা অধিকার ভোগ করে না। স্ত্রী পুরুষ সকলের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সমান মর্যাদা ও অধিকার ভোগ করতে দেখা যায়।

স্থায়ী কৃষিজীবীদের স্তরে এসে সামাজিক প্রভেদ, ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য তথা শ্রেণীভেদের সূত্রপাত পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু তা খুব ব্যাপক নয়।

উপজাতি সমাজে যে আদিম গণতন্ত্রের রূপ দেখতে পাওয়া যায়, নীচের স্তরগুলিতে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রই তার আওতায় পড়ে। গ্রাম বা সমাজের প্রধান এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা নির্বাচিত হয় এবং দৈনন্দিন কার্যনির্বাহ করে সমগ্র সমাজের প্রতিভূ হিসাবে। কোনো গুরুতর সমস্যা ও প্রশ্ন উপস্থিত হলে সমাজের

সকল সভ্য মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত করে। উপজাতীয়দের নিকট সেই সিদ্ধান্ত হল বিধাতার বিধানের মতই অমোঘ এবং সমাজ থেকে বহিষ্কার হল প্রাণদণ্ডের সমতুল্য।

যেসব উপজাতি অর্ধ-স্থায়ী বা স্থায়ীভাবে একস্থানে বাস করতে অভ্যস্ত সেখানে তাদের সামাজিক সংগঠনের ভৌগোলিক ভিত্তি হল গ্রাম। এদের মধ্যে সাধারণত বিভিন্ন পরিবারের কর্তাদের নিয়ে গঠিত গ্রাম-সভাই হল সমাজের সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারী। গ্রামপ্রধান নিজ ক্ষমতায় মাত্র কতকগুলি প্রথাগত ভাবে সুনির্দিষ্ট কাজ করতে পারে। বিশেষ কোনো সমস্যা উপস্থিত হলে গ্রামের সমস্ত নরনারী একত্রে মিলিত হয়। তাছাড়া প্রতিবৎসর এক নির্দিষ্ট দিনে আনুষ্ঠানিকভাবে সকলের একত্রে মিলিত হওয়ার রেওয়াজ আছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সেইদিন গ্রামের পুরাতন কর্মকর্তাগণ আনুষ্ঠানিকভাবে সকলের সামনে পদত্যাগ করে এবং পুনর্নির্বাচিত হয়।

স্থায়ী কৃষিজীবী উপজাতিদের জনসংখ্যা নীচের স্তরের উপজাতিদের তুলনায় অনেক বেশী। এরা পরস্পর সংলগ্ন ভূখণ্ডে একটি বৃহৎ অঞ্চল জুড়ে বাস করে। এই সব ক্ষেত্রে অতীতে গ্রামসভা ছাড়াও আন্তঃ গ্রাম এবং আন্তঃ অঞ্চল সভা গড়ে উঠেছিল। সেগুলির কর্মকর্তারা অনেক ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচিত হয়। আন্তঃ গ্রাম তথা আন্তঃ অঞ্চল বিরোধে এবং সকলের সম্মিলিত প্রশ্নে সংশ্লিষ্ট সভা অর্থাৎ আন্তঃ গ্রাম বা আন্তঃ অঞ্চল সভা সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী। বৎসরে একদিন অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত গ্রামের প্রতিনিধিরা আনুষ্ঠানিকভাবে মিলিত হয়। এই সম্মেলন হল সেই উপজাতির সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী সংস্থা। তার সিদ্ধান্তই উপজাতি সমাজের পক্ষে চূড়ান্ত।

এই স্তরের উপজাতিদের মধ্যে কতকগুলি ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, গ্রাম ও অঞ্চল প্রধানের পদ ক্রমশঃ বংশগত পদে পরিণত হয়ে এসেছে। প্রধানের ক্ষমতাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অতীতে এদের মধ্যে রাজা, সর্বোচ্চ প্রধান প্রভৃতি পদের সৃষ্টি হয় এবং সেগুলি বংশগত পদে পরিণত হয়। প্রথম প্রথম ঐ সব পদের অধিকারীদের উপজাতি সম্মেলনের মতামত ও সিদ্ধান্ত মেনে চলতে হত। পরবর্তীকালে এরা ক্রমশঃ উপজাতি সঙ্ঘের ক্ষমতাকে অনেক খর্ব করে এনেছে বটে কিন্তু তাকে একেবারে লুপ্ত করে দিতে পারেনি। দ্বিতীয়ত যেসব ক্ষেত্রে যৌথ ক্ষমতা খর্ব হয়ে এসেছে তার মূলে কাজ করেছে একদিকে সমাজের যৌথ অর্থনীতির ভাঙ্গন এবং অন্যদিকে অন্-উপজাতীয় সমাজের প্রভাব ও অন্-উপজাতীয় রাজশক্তির সহায়তা।

বর্তমানকালে এই সমস্ত গ্রাম, আন্তঃগ্রাম এবং আঞ্চলিক সংস্থাগুলির ক্ষমতা খুবই সীমিত। তাদের কর্তৃত্ব শুধু সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথা পালনের ব্যাপারে সীমাবদ্ধ। তবু উপজাতীয়দের কাছে পুরাতন সামাজিক সংগঠনের এই অবশেষগুলির মর্যাদা এখনও অপরিসীম। যেসব ক্ষেত্রে সমাজের ভাঙন অনেকখানি এগিয়ে গেছে সেখানেও দেখা যায় যে, উপজাতীয়দের চেতনায় সেই প্রাচীন আদিম গণতন্ত্রের ভগ্নাবশেষগুলির প্রভাব খুব প্রবল।

উপরোক্ত প্রভাব বিশেষভাবে জীবন্ত রয়ে গেছে উপজাতীয় সংস্কৃতির মধ্যে। এদের মধ্যে জীবনের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক আজও প্রত্যক্ষ এবং সুস্পষ্ট। যৌথ কার্যকলাপ এবং চেতনাই ছিল সে সংস্কৃতির প্রাণবস্তু। নিম্নস্তরের উপজাতীদের মধ্যে তা এখনও মোটামুটি বজায় রয়ে গেছে। উন্নততর উপজাতিদের বেলাতেও দেখা যায় যে, সমাজ এবং অর্থনীতির ভাঙ্গন সত্ত্বেও সেই যৌথ চরিত্রের চিহ্ন আজও তাদের

সংস্কৃতিতে সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। অন্যান্য কাজের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। এই সব উৎসব অনুষ্ঠান সমগ্র গ্রাম-সমাজ যৌথভাবে পালন করে। আর অনেকক্ষেত্রে বৎসরে একবার আনুষ্ঠানিক শিকার উৎসব পালনের দ্বারা আজও উপজাতি সঙ্ঘের অতীত সংহতির স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। যৌথ অনুষ্ঠানগুলিতে গ্রামপ্রধান এবং পুরোহিত সমগ্র সমাজের প্রতিনিধিরূপে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। আর কতকগুলি অনুষ্ঠান আছে যেগুলিকে পরিবারগত বলা যেতে পারে অর্থাৎ কোনো পরিবারে জন্ম, বয়ঃপ্রাপ্তি, বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টি সংক্রান্ত অনুষ্ঠান। সেগুলিতেও সমগ্র গ্রামকে নিমন্ত্রণের প্রথা প্রচলিত। এই সব উৎসব বা অনুষ্ঠানেও গ্রামপ্রধান এবং পুরোহিত সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে বিশেষ সম্মানের অধিকারী।

উপজাতিদের লোকনৃত্য ও গীতে যৌথ প্রকৃতির প্রাধান্যের কথা সুবিদিত। যে সব নৃত্য ও গীত হল সমগ্র সমাজের দ্বারা যৌথভাবে পালিত উৎসব অনুষ্ঠানের অঙ্গ, সেইগুলির মধ্যেই প্রাণশক্তির বলিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়।

বিভিন্ন স্তরের উপজাতির এবং একই স্তরের উপজাতিদের মধ্যে সামাজিক রীতিনীতি রেওয়াজের অনেক পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু উপরে যে কথাগুলি বলা হয়েছে সেগুলি সাধারণ চরিত্র রূপে কমবেশী সমস্ত উপজাতির মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। যৌথচেতনার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায় তাদের লোককথায়। সমাজবিজ্ঞানীরা সাধারণতঃ এদের লোককথাকে দেখেন আদিম যুগের মানুষের অপরিণত মন ও চিন্তার স্বাক্ষর হিসাবে। কিন্তু ম্যাকসিম গর্কী লোককথার এক নূতন এবং গভীর তাৎপর্যপূর্ণ দিক তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, লোককথার মধ্যে পাওয়া যায় জনগণের সমবেত চিন্তা, অভিজ্ঞতা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার ইতিহাস। তার মধ্যে থাকে যুগ যুগ সঞ্চিত যৌথ অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। সুতরাং লোককথা হল জনগণের সমবেত সৃষ্টি। সেই আদিম যুগ থেকেই তার সূচনা। আদিম সাম্যবাদী সমাজের মানুষ প্রকৃতি ও বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইতে নূতন নূতন জয়লাভ করে এগিয়ে চলেছে। তারা বাধাবিপত্তির সঙ্গে যুদ্ধে জয়ের কামনা করেছে। স্বপ্ন দেখেছে সুন্দর সুখী জীবনের। সেই সব অভিজ্ঞতা জয়ের কাহিনী, আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির কল্পনারঙিন অভিব্যক্তি হয়েছে লোককথায়। গর্কী সোভিয়েট ইউনিয়নের তদানীন্তন পশ্চাদপদ জাতিগুলির দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন যে, যে-সব জনসমষ্টিকে আপাতদৃষ্টিতে, খুবই পিছনে-পড়া বলে মনে হয় তাদেরও লোককথার মধ্যে অমূল্য সম্পদের সন্ধান মেলে। লিখিত ভাষা ও সাহিত্য না থাকা সত্ত্বেও এরই মাধ্যমে তারা নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রবাহকে জীবিত করে রাখে। শত কষ্ট, দুঃখদুর্দশা এবং অবমাননার মধ্যেও সুন্দর সুখীজীবনের কামনার দীপশিখাকে অনির্বাণভাবে জ্বালিয়ে রাখে রূপকথা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে।

লোককথার বীরকাহিনীগুলিতে যেসব অলৌকিক শক্তিধর পুরুষের দেখা পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে গোর্কী সম্পূর্ণ নূতন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তিনি বলেন যে, ঐ সব মহাবীরেরা হলেন সমাজের সমষ্টিগত শক্তির প্রতীক। আদিম সাম্যবাদী সমাজে মানুষ ছিল সঙ্ঘজীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সেদিন শুধুমাত্র সঙ্ঘশক্তির জোরেই প্রকৃতি বা বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব ছিল। তাই যেমন জীবিত কুলপতি বা গোষ্ঠিপতি বা সঙ্ঘনায়ক যথাক্রমে সমগ্র সমাজের প্রতীকরূপে মর্যাদার অধিকারী হত, অনুরূপভাবে মহাবীরদের চরিত্রচিত্রণের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে

সেই যৌথশক্তির প্রতি বিশ্বাস। সেইজন্য তাঁরা লোকোত্তর শক্তির অধিকারী, দেবতার প্রতিদ্বন্দ্বী এবং অপরাজেয়।

ভারতের উপজাতিদের লোককথা সম্বন্ধে এখনও অনেক কিছু জানার বাকী আছে। এ পর্যন্ত যেসব সংগ্রাহকেরা সেই কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন তাঁদের সামনে কোনো সুস্পষ্ট পরিপ্রেক্ষিত ছিল না। তাঁরা আদিম জাতি বা নৃ-গোষ্ঠী সম্বন্ধে নৃ-তত্ত্বের প্রচলিত ধারণা নিয়েই সংগ্রহ এবং অনুসন্ধান করছেন। তবু যেটুকু তথ্য পাওয়া যায় তা থেকেই গোর্কীর বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়। দেখা যায় যে, প্রত্যেক উপজাতির মধ্যেই আত্মমর্যাদা বোধ খুব প্রবল এবং নিজেদের অতীত সম্বন্ধে একটা গৌরবময় ধারণা তাদের মনে সজাগ রয়েছে। যেসব উপজাতিকে আপাতদৃষ্টিতে খুবই পশ্চাৎপদ বলে মনে হয়, যারা সমাজ বিকাশের দৃষ্টিতে একেবারে আদিম অর্থাৎ খাদ্য-সংগ্রাহক এবং পশুপালকের স্তরে পড়ে আছে তাদের বেলাতেও একথা প্রযোজ্য। 'অনেক উপজাতির লোক কথায় এক বিগত বিস্মৃতপ্রায় স্বর্ণযুগের কল্পনা গড়ে উঠেছিল তাদের চিরাচরিত জীবিকা প্রণালীকে আশ্রয় করে। আর সেই কল্পনার মাধ্যমে তারা এক সুন্দর ও সুখী জীবনের স্বপ্নের দীপশিখাকে অনির্বাণভাবে জ্বালিয়ে রেখেছে। তাদের জীবনের উপর দিয়ে ঘটে গেছে বহু বিপর্যয়। অন্-উপজাতীয় শোষকদের হাতে ঘটেছে বহু লাঞ্ছনা এবং অবমাননা। তবু তারা হতাশার কাছে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণ করেনি।

ভারতের উপজাতিদের লোককথায়ও অনেক অনবদ্য মহাবীর চরিত্রের দেখা মেলে। অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা দেবতার পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। তাঁরা যে আসলে ছিলেন উপজাতি সমাজের মহানায়ক এবং সেই সমাজের যৌথ অভিযানের প্রতীক তা কাহিনীগুলির মধ্য দিয়ে বেশ পরিষ্কারভাবেই ফুটে ওঠে। রূপকথা এবং বীরচরিত্র সৃষ্টির ধারা আজও উপজাতীয় চেতনায় ফল্গুপ্রবাহের মত বয়ে চলেছে। আধুনিক কালেও উপজাতিদের যেসব বিদ্রোহ এবং অভ্যুত্থান হয়েছে তার নেতাদের নিয়ে রচিত হয়েছে অনেক অমর কাহিনী। মরেও তাঁরা মরেন না এবং শত্রুর কারাগার তাঁদের বন্দী করে রাখতে সমর্থ হয় না। তাঁদের লোকোত্তর শক্তি এবং অপরাজেয়তার কিম্বদন্তী প্রকৃত প্রস্তাবে উপজাতি সমাজের সঙ্ঘশক্তির প্রতি বিশ্বাসেরই শিল্পায়িত অভিব্যক্তি। তার মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে হার না-মানার দুর্জয় সঙ্কল্প। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে উপজাতিদের লোককথাগুলিকে বিশ্লেষণের চেষ্টা আজ পর্যন্ত খুব বেশী হয় নি। অনুসন্ধান এবং অধ্যয়নের এক অন্তহীন সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র অনাবিষ্কৃতভাবে পড়ে রয়েছে।

মোগল আমল থেকে সুরু করে ব্রিটিশ শাসনের যুগ পর্যন্ত বহুবার বিভিন্ন উপজাতির যে সব অভ্যুত্থান হয়েছে সেগুলির পর্যালোচনার দ্বারা একটি জিনিস খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভিন্-জাতির শোষকদের অর্থনৈতিক শোষণের ক্ষেত্র ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়ে উপজাতিদের জীবনে অনেক দুঃখ ও বিপর্যয় ডেকে এনেছে। সেগুলিকে তারা অনেকদিন পর্যন্ত নির্বিবাদে সহ্য করে গেছে। কিন্তু যখনই উপজাতি সমাজের যৌথ কর্তৃত্বের উপর আঘাত এসেছে বা সমাজের মর্যাদার অবমাননা ঘটেছে তখনই তাদের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তাদের বিক্ষোভ তখন উঠেছে বাঁধ ভাঙা বন্যা স্রোতের মত দুর্দাম হয়ে। তীর-ধনুক আর বর্শা হাতে তারা কামান বন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে মৃত্যুভয়হীন প্রতিরোধের অমর উদাহরণ রেখে গেছে।

গত কয়েক দশক ধরে উপজাতীয়দের যেসব গণআন্দোলন হয়েছে তার অভিজ্ঞতাও একই সাক্ষ্য দেয়। অনেক সময় মনে হয়েছে যে, এরা বুঝি সব কিছু নিঃশব্দে সয়ে যায়। কিন্তু যখন তাদের উপজাতীয় মর্যাদা

বা সংহতিবোধে আঘাত লাগে তখন এই বোবা সহিষ্ণু মানুষগুলিই বর্ষার জলে উচ্ছ্বসিত দুরন্ত পাহাড়ী নদীর মত ক্ষেপে ওঠে।

এই সজ্ঞচেতনার আলোচনা থেকে দুটি প্রশ্ন ওঠে। গণ আন্দোলনের ক্ষেত্রে সে চেতনা যেমন সংগ্রামী রূপ নেয়, তেমনি আবার অনেক ক্ষেত্রে তা রক্ষণশীলতার শক্তি হিসাবে কাজ করে। উপজাতীয় সমাজের কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, এবং তাদের সমাজের বাইরের লোকের সম্বন্ধে সাধারণ অবিশ্বাস ইত্যাদি দিকও ঐ চেতনার অঙ্গ। অথচ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, উপজাতিদের উন্নয়নের বৃহত্তর স্বার্থে অতীতের বহু প্রথা, বিশ্বাস ও সংস্কারকে বর্জন করতে হবে। নূতন ও পুরাতনের অবশ্যম্ভাবী দ্বন্দ্বে সজ্ঞচেতনার ভূমিকা কি হবে? যেখানে তা পরিবর্তনের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়াবে সেখানে কি করণীয়?

উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর হিসাবে একটি সাধারণ নীতি নির্দেশ করা কঠিন নয়। কোন সমাজই একেবারে অনড় অচল নয়। উপজাতি সমাজেও পরিবর্তনের প্রক্রিয়া যে আদৌ দেখা যায় না তা মনে করা ভুল। উপজাতিসমাজের ভিতর থেকেই সংস্কারের তাগিদ মাথা তোলে এবং সজ্ঞ চেতনার প্রচলিত রূপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই তা আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। যে সব উপজাতি যত বেশী বাইরের জগতের সংস্পর্শে এসেছে তাদের জীবনে যেমন ভাঙনের প্রক্রিয়া সুরু হয়েছে তেমনি নূতন ও পুরাতনের সংঘাত মাথা তুলেছে। আধুনিক কালের ইতিহাসে এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যেখানে উপজাতি-সমাজে একদিকে বাইরের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং অন্যদিকে সংস্কারের প্রচেষ্টা একই ধারায় মিলিত হয়ে প্রবল প্রবাহের সৃষ্টি করেছে। তাদের উপর বাইরে থেকে মুরুব্বিয়ানার মনোভাব নিয়ে পরিবর্তন চাপিয়ে দিতে গেলে ফল খুব অকল্যাণকর হয় নিঃসন্দেহ। তা সে জিনিস যতই আধুনিক এবং প্রগতিপন্থী হোক্ না কেন। কিন্তু যাতে পরিবর্তনের আগ্রহ তাদের ভিতর থেকে আসে সেজন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব। উপজাতিদের বিচ্ছিন্নতা দূর হলে এবং তাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে আধুনিক যুগচেতনার প্রসারের দ্বারাই সে পথ প্রশস্ত হবে।

যাঁরা উপজাতি-সমাজের বাইরে থেকে উপরোক্ত প্রক্রিয়াকে সাহায্য করতে ইচ্ছুক এবং উদ্যোগী হবেন তাঁদের করণীয় আছে অন্যভাবে। প্রথমতঃ, উপজাতীয়দের মধ্যে আধুনিক যুগের প্রগতিশীল চিন্তাধারা প্রসারের শ্রেষ্ঠ উপায় এবং পদ্ধতি নিয়ে গবেষণার অনেক কিছু আছে। ইতিহাসের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, প্রগতিশীল চিন্তাধারা যখন কোন জনসমষ্টির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, মননভঙ্গী এবং চিন্তারূপগুলিকে অবলম্বন করে প্রকাশিত হয় তখনই তা সহজে সংশ্লিষ্ট জনগণের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে। সুতরাং ঐ জিনিসগুলিকে বিশদভাবে অধ্যয়নের প্রয়োজন খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়তঃ উপজাতিদের মধ্যে পরিবর্তনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির সমস্যা রয়েছে। এবিষয়ে রাষ্ট্রের দায়িত্বই সমধিক। কিন্তু যাঁরা সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাটি অধ্যয়ন করেন তাঁরা সে দায়িত্ব পালনের শ্রেষ্ঠ পথের ইঙ্গিত দিতে পারেন।

পরিবেশ সৃষ্টির কথা থেকেই ওঠে দ্বিতীয় প্রশ্নটি। তার গুরুত্ব অনেক বেশী। উপজাতিদের সজ্ঞচেতনার যা বনিয়াদ সেই যৌথঅর্থনীতি এবং জীবনযাত্রার ভাঙন ধনতান্ত্রিক সভ্যতার সংস্পর্শে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে। যেখানে ভাঙন বেশী অগ্রসর হয় নি সেখানেও তার মূলে লেগেছে প্রচণ্ড আঘাত। সমস্ত ক্ষেত্রেই তাদের জীবিকার পুরাতন ভিত্তির ক্ষেত্র ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে। এই

প্রক্রিয়া এখনও শেষ হয় নি। কাজেই এদের উন্নয়ন বা কল্যাণের কর্মসূচীতে প্রথমেই আসে পুনর্বাসনের কথা। কিন্তু পুনর্বাসন হবে কোন্ স্তরে? এদের জীবন ও অর্থনীতির ভাঙনের প্রক্রিয়াকে রোধ করে বিপরীত দিকে ঘোরানো অর্থাৎ সেই পুরাতন আদিম বা অর্ধআদিম অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাদের পিছনের দিকে ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা ইতিহাসের বিচারে যেমন অবাস্তব তেমনি অবাঞ্ছনীয় ও প্রতিক্রিয়াপন্থী প্রচেষ্টা হবে।

এদের জীবনের বনিয়াদকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এক উন্নততর স্তরে যেখানে তারা আধুনিক সভ্যতার অবদানগুলির সাহায্য ও সুযোগ পেতে পারে অথচ সেই সভ্যতার অভিশাপ থেকে মুক্ত থাকে। কিন্তু যদি ধনতান্ত্রিক সমাজের কাঠামোর ভিতরে এদের পুনর্বাসন তথা উন্নয়নের কথা চিন্তা করা হয় তবে সে আশা আকাশকুসুমের মতই অবাস্তব প্রমাণিত হতে বাধ্য।

উপজাতিদের জীবনযাত্রার বনিয়াদকে উন্নতস্তরে পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং তাদের সঙ্ঘচেতনা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলিকে বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ দেওয়া সম্ভব হতে পারে শুধু সমাজতান্ত্রিক সমাজের পরিবেশে। সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রাক্-বিপ্লব যুগে যেসব পশ্চাৎপদ জাতি আমাদের দেশের উপজাতিদেরই অপুরূপ অবস্থায় ছিল তাদের উন্নতি এবং বিকাশের অভিজ্ঞতাকে এবিষয়ে পথ-নির্দেশক রূপে নেওয়া যেতে পারে। সোভিয়েট এশিয়ার জাতিগুলির উন্নতির অভূতপূর্ব এবং বিস্ময়কর প্রক্রিয়া অনেক পর্যালোচককে অভিভূত করেছে। কিন্তু তাঁদের অনেকে সে প্রক্রিয়ার সামাজিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সমর্থ হন নি। সেখানে তাদের অর্থনীতি ও জীবনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছে সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন এবং যৌথ কৃষির ভিত্তিতে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং সামাজের কাঠামোর ভিতরে ঐ সব পশ্চাৎপদ জাতির উন্নয়নের কর্মকাণ্ড সুরু হওয়াতে তারা ধনতন্ত্রের অভিজ্ঞতাকে এড়িয়ে সরাসরি সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। তার ফলে তাদের যৌথকার্যকলাপ ও যৌথক্ষমতার বিকাশের অনেক উন্নত এবং বৃহৎ সম্ভাবনাপূর্ণ পরিপ্রেক্ষিত খুঁজে পেয়েছে। মাত্র কয়েক দশকের প্রচেষ্টায় সেখানে আত্মপ্রকাশ করেছে নব সৃষ্টির প্রাণবন্যা। কয়েক দশক আগেও যে-সব জাতির কোন লিপি ও লিখিত সাহিত্য ছিল না সেইখানে সমাজতান্ত্রিক চেতনায় অনুপ্রাণিত জাতীয় সাহিত্য বিকশিত হয়ে বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে সম্মানের আসন দাবী করছে। এই সব জাতির সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশে তাদের লোককথার সম্পদ এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

সাধারণ সূত্র হিসাবে উপরের বক্তব্যের মধ্যে হয়ত খুব জটিলতা নেই। কিন্তু সেই সূত্রের বাস্তব রূপায়ণের কাজে অনেক অধ্যয়নের প্রয়োজন আছে। তেমনি প্রয়োজন হল উক্ত অধ্যয়নের অভিজ্ঞতাকে আমাদের দেশের উপজাতিদের জীবনে প্রয়োগের বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ এবং সমাজসচেতন গবেষণা।

আমাদের দেশে বর্তমানে যে ধরনের অর্থনীতি ও সমাজ গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে তা 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ' বা 'মিশ্র অর্থনীতি' ইত্যাদি গালভরা নাম সত্ত্বেও আসলে ধনতান্ত্রিক সমাজ গঠনেরই প্রচেষ্টা। ভারতের জনগণের জীবনের অন্যান্য অনেক মৌলিক সমস্যার মত উপজাতি সমস্যার সমাধানও ধনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে সম্ভব নয়। সাধারণ নীতি হিসাবে রাষ্ট্র যা মেনে নিয়েছে তাকে বাস্তবে পরিণত করার সময় ধনতন্ত্রের দৃষ্টিতে রচিত পরিকল্পনা অনেক বাধা সৃষ্টি করে। সেই পরিকল্পনার মাধ্যমে যেটুকু আশু উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল তাও আমলাতন্ত্রের দৌলতে ব্যর্থতায় পরিণত হয়। আর প্রধানতঃ তারই

প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অনেক ক্ষেত্রে উপজাতিদের আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন পরিচালিত হয় বিভেদমূলক পথে।

উপজাতীয়দের সংগ্রাম সমগ্র ভারতীয় জনগণের জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সংগ্রামের অচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেই সত্যটিকে উপরে তুলে ধরে এবং তাদের সামনে উন্নতির যথার্থ পরিপ্রেক্ষিত নির্দেশ করেই উপজাতীর এবং অন্-উপজাতীয় জনগণের মধ্যে ঐক্যের পথ প্রশস্ত করা সম্ভব হবে। সেই কাজে প্রগতিশীল সমাজবিজ্ঞানীরা তাঁদের অধ্যয়ন এবং গবেষণার দ্বারা বিশেষ অবদান দিতে পারেন। সমাজবিজ্ঞানের অনুশীলন যদি জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হয় এবং নৃ-তাত্ত্বিক গবেষণা যদি নিছক তথ্যসংগ্রহে সীমিত না থেকে নবদিগন্ত নির্দেশের ব্রত গ্রহণ করে তবেই তা সম্ভবপর হতে পারে।

---

* সমস্যাটির সামগ্রিক পরিচিতি দেওয়ার চেষ্টা লেখক অন্যত্র করেছেন। রুষ-ভারতী আগস্ট-অক্টোবর ১৯৬১ এবং প্রবাসী, কার্তিক সংখ্যা ১৩৬৮ দ্রষ্টব্য।

মানব-মনের সুস্থতা ও বিকার (১)

রুদ্রেন্দ্র কুমার পাল

দেহের সঙ্গে মনের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ; দেহ খারাপ হলে মনও খারাপ হয় এবং মন খারাপ চলতে থাকলে পরিণামে শরীরও খারাপ হতে বাধ্য। কিন্তু কোন্‌টি মুখ্য আর কোন্‌টি গৌণ ? বীজ হতে যেমন গাছ, আবার গাছ হতেও তেমনি বীজের উদ্ভব, এও কি ঠিক তেম্নি ? কয়েকটি বিশিষ্ট রোগ, যেমন উন্মাদ রোগ, হিস্টিরিয়া প্রভৃতি মানসিক রোগকে আগে দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিংবা তাদের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সংশ্রবশূন্য নিছক মনের রোগ বলেই মনে করা হত। মনীষী পাভলভই গবেষণাগারে পশু-পাখীদের উপর বিশিষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং মানসিক রোগের হাসপাতালে বিকারগ্রস্ত রোগীদের লক্ষণগুলি পূর্বাপর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচারের ফলে মানসিক বিকারের কারণ সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট মতবাদকে অনুমানের স্তর হতে সুদৃঢ় একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপন করেন। এই মতানুসারে প্রত্যেক মানসিক রোগের মূলেই আছে মস্তিষ্কের কোন না কোন অংশের অস্বাভাবিকতা অর্থাৎ যে ক্যানভাসের উপর সুস্পষ্ট মানসিক রোগের ছবি দেখা যাচ্ছে, কোনরূপে সে চিত্রকে ধুয়ে মুছে ফেল্লে নিশ্চয়ই তার নীচ থেকে আত্ম প্রকাশ করবে দেহের কোন না কোন অংশের বৈকল্যের ছবি।

অভিব্যক্তির সর্বোচ্চস্তরে মানুষের আসন, অর্থাৎ এই স্তরে সে পৌঁচেছে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে তার মস্তিষ্কের আকৃতি ও প্রকৃতিগত ক্রমোন্নতির ফলে। জন্তু-জানোয়ারদের মস্তিষ্কের সঙ্গে মানুষের মস্তিষ্কের তফাৎ এই যে, মানবেতর প্রাণীর মস্তিষ্কের কাজ হয় মুখ্যতঃ প্রথম সঙ্কেততন্ত্রের প্রভাবে, অর্থাৎ তাদের চোখ, কান, নাক প্রভৃতি বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা যে সকল অনুভূতি মস্তিষ্কে পৌঁছায় এবং তার ফলে যৎসামান্য অনুভূতিটুকু (traces) মস্তিষ্কের ঐ কেন্দ্রগুলিতে থেকে যায় তাই প্রতিবর্তিত হয় প্রয়োজনমত ঐ সকল ইন্দ্রিয় সংশ্লিষ্ট দেহাংশে। এরই নাম “ধারণা” অর্থাৎ প্রাকৃতিক বা সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা। এ পর্যন্ত ইতর প্রাণী ও মানুষের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু মানুষের বিশেষত্ব হ'ল তার মস্তিষ্কের মধ্যে দ্বিতীয় সংকেততন্ত্রের আবির্ভাব ও সক্রিয়তা, অর্থাৎ প্রথম সঙ্কেততন্ত্রের প্রভাবকে উপযুক্ত ভাষায় (Speech) রূপান্তরিত করা। দ্রষ্টব্য, শ্রাব্য কিংবা আস্বাদ্য বস্তু কাছে না থাকলেও, কবে কোনদিন আমরা কী দেখেছিলুম, শুনেছিলুম কিংবা খেয়ে তৃপ্তিলাভ করেছিলুম, কথ্য বা লেখ্য ভাষায় তার যথাযথ এবং সময়ে সময়ে কবিত্ব ফুটিয়ে কিংবা তিলকে তাল করেও তার বর্ণনা করতে পারি, আবার সময়ে সময়ে সত্যিকার মনের ভাবকে চেপে রেখে দ্ব্যর্থকভাষা কিংবা ছদ্ম প্রশংসার ছলে নিন্দা বা ছদ্ম নিন্দার ছলে প্রশংসাও করতে পারি। কিন্তু অপরের মনের ভাব বুঝতে পারা কিংবা নিজের মনোভাবকে অপরের কাছে যথাযথ ভাবে ব্যক্ত করা, অর্থাৎ দ্বিতীয় সংকেততন্ত্রের ক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে প্রথম (সেজন্য একে প্রাথমিক বলাই যুক্তিসঙ্গত) সংকেত তন্ত্রের উপর।

গুরু মস্তিষ্কে অবস্থিত প্রথম সংকেততন্ত্রের অস্বাভাবিকতা বা বৈকল্যের ফলে গুরুমস্তিষ্কের নিকটবর্তী ও নিম্নে অবস্থিত মস্তিষ্কের অন্যান্য (adjacent subcortical regions) অংশগুলির দ্বারা সংঘটিত জটিল

পরাবর্ত ক্রিয়াগুলি ব্যাহত হওয়াতে, দৈহিক ও মানসিক দু'রকমেরই বিকলন ঘটতে পারে। বহিরাগত অস্বাভাবিক উত্তেজনা কিংবা দেহাভ্যন্তরিক কোন অংশের অস্বাভাবিক প্রভাব ইতর প্রাণিদের প্রথম সংকেততন্ত্রের ক্রিয়াগণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও, মানুষের বেলা ঐগুলি হতে তা ছড়িয়ে পড়ে দ্বিতীয় সংকেততন্ত্রের মধ্যে এবং তারই ফলে জন্মে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট উপলব্ধি এবং যথাযথ ধারণা। পাভলভের মতে এ ভাবেই গড়ে উঠে মানুষের নিজ নিজ বিশিষ্ট প্রকৃতি। এ ভাবে মানুষের প্রকৃতি শুধু যে বিশেষ বিশেষ যেমন চোখ, কান, নাক, জিহ্বা, কিংবা ত্বক্‌মধ্যস্থ স্পর্শ, তাপ, বেদনা প্রভৃতি সাধারণ ইন্দ্রিয় দ্বারা ঘটিত পরাবর্ত্ত ক্রিয়াই নয়, অধিকন্তু শোণিত, লসিকা, মেরুমস্তিষ্ক তরল পদার্থগুলির দ্বারা বাহিত, দেহের যে কোন কলাতে (এমন কি নার্ভেও) উৎপন্ন রাসায়নিক উপাদানের প্রভাবও দ্বিতীয় সংকেততন্ত্রের দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। কিন্তু সেখানে এগুলির দ্বারা কী প্রতিক্রিয়া হবে, তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে সমগ্র নার্ভতন্ত্রের গঠন, স্বাস্থ্য ও শক্তির উপর। জন্ম হতেই দুর্বল যাদের নার্ভতন্ত্র কিংবা বহুদিন রোগে ভুগে কিংবা দুঃসহ শারীরিক বা মানসিক অভিঘাতে যাদের নার্ভতন্ত্র একেবারে তছনছ হয়ে গেছে, তাদের পক্ষে গুরুমস্তিষ্কের অবতেজক (inhibitory নিস্তেজক) ক্ষমতা না থাকাতে কিংবা অত্যন্ত হ্রাস পাওয়াতে অধস্তন অংশগুলি ঐ নিয়ন্ত্রণ প্রভাব মুক্ত স্বয়ংক্রিয় কিংবা অত্যধিক সক্রিয় হয়ে ওঠাতেই বিপত্তি ঘটে। ফলে নিম্নলিখিত অস্বাভাবিকতাগুলি দেখা দেয়; (১) নিদ্রাহীনতা, অর্থাৎ গুরুমস্তিষ্কের অবতেজক (নিস্তেজক) প্রভাবের সম্পূর্ণ অক্ষমতা। আবার সময়ে সময়ে ঠিক উল্টোও দেখা যায় অর্থাৎ একবার ঘুমিয়ে পড়লে ঘুম আর ভাঙতেই চায় না। (২) গুরুমস্তিষ্কের সঙ্গে অধস্তন মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশের কিংবা ঐরূপ অন্যান্য অংশের সঙ্গে গুরুমস্তিষ্কের, দু'দিকেই সহযোগিতাপূর্ণ যোগাযোগের অভাবে নানা অস্বাভাবিক পরাবর্ত ক্রিয়া দেখা দেয়; যেমন, অযথা আশঙ্কা, চাঞ্চল্য, ক্রোধ প্রভৃতি এবং (৩) প্রথম ও দ্বিতীয় সংকেত কেন্দ্রের পারস্পরিক সক্রিয় সহযোগিতার অভাবে অপরের ব্যবহার বা কথা-সম্বন্ধে ভুল ধারণা কিংবা বেপরোয়া বা সামঞ্জস্য-হীন কথাবার্তা।

প্রত্যেক মানুষেরই ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ নির্ভর করে তার নার্ভতন্ত্রের শক্তি ও যে সমাজে সে বাস করে তার সঙ্গে নিজকে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা অনুসারে। এ দুটি গুণ সমান্তরালভাবে একে অন্যের সঙ্গে সব সময়ে সহযোগিতা নাও করতে পারে অথবা একে অন্যের পরিপূরক নাও হতে পারে, অর্থাৎ সময়ে সময়ে তাদের মধ্যে ছোট খাটো বিরোধ লেগেই থাকে, তা যখন স্বাভাবিক গণ্ডির সীমা পার হয়ে যায়, তখনই গুরুতর অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে বিপর্যয় ঘটে। এ সঙ্গে স্বতঃই প্রশ্ন উঠে "মজবুত নার্ভতন্ত্রের পয়িচয় কী-সে পাওয়া যায়?" অনভ্যস্ত, অপ্রিয় এবং দুর্বিষহ পরিবেশে যে-নার্ভতন্ত্র সমস্যার উপযুক্ত সমাধান খুঁজে নিয়ে নিজেকে অনাহত ও অক্ষত রাখতে পারে তারই নাম দৃঢ় বা মজবুত নার্ভতন্ত্র, যার ফলে মানুষ সমস্যার বিশ্লেষণের দ্বারা উপযুক্ত বিচারবুদ্ধির সাহায্যে প্রতিকূল পরিবেশকে জয় করে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। নার্ভের শক্তির দ্বারা প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম বা তাকে পরাভূত করার সময়েও সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে সংগ্রামের পথ বেছে নিতে হয় কিংবা বিজয়ের পথে এগিয়ে যেতে হয়। এ ভাবে জীবনযুদ্ধে পুরাতন অভিজ্ঞতার প্রভাব, কিংবা রোগ, শোক, দুঃখ, দৈন্য বা আঘাত-জনিত স্নায়বিক দৌর্বল্যের ফলাফলকে সম্পূর্ণ ভাবে পরিহার করা সম্ভবপর নয়। এগুলি যেমন কতকটা বাধার সৃষ্টি করে, অনুরূপ অবস্থায় পরিপন্থী পরিবেশকে আয়ত্তাধীন করার সুখস্মৃতি অন্যভাবে আবার সঙ্কটজনক মুহূর্তে তাদের জয় করতেও বিস্তর সাহায্য করে। সুতরাং প্রায়ই দেখা যায় দৃঢ় নার্ভশক্তির উপরও এসে পড়েছে নানা প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে পুরাতন অভিজ্ঞতার ছায়া।

অনেকেই সহজে অনভ্যস্ত প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না, এটাকে নিছক মস্তিষ্কের গতিশীলতার অভাব মনে করা উচিত নয়। প্রাক্তন জীবনের বহু তিক্ত অভিজ্ঞতাই এরূপ অনভ্যাসের জন্য মুখ্যতঃ দায়ী। এ সঙ্গে আর একটি বিষয়ও মনে রাখা উচিত, তা হচ্ছে উত্তেজক এবং নিস্তেজক ক্রিয়ার (excitatory and inhibitory processes) পারস্পরিক সম্পর্ক। গুরুমস্তিষ্কের ক্রমবর্ধমান নিস্তেজনার প্রভাবে অনভ্যস্ত নতুন পরিবেশ জনিত উত্তেজনা অতি সহজেই অবদমিত হয় বলে অচিরে নতুন পরিস্থিতিতেও অভ্যস্ত হওয়া সম্ভব হয়। এরই ফলে নতুন নতুন অভ্যাস আয়ত্ত হতে থাকে এবং পুরনোগুলি না বদলায় অর্থাৎ যেমন ছিল তেমনি থাকে তাহলে অবদমনক্ষম মনে সংঘাত উপস্থিত হতে পারে। আবার নতুন নতুন অবতেজক অভ্যাসের আবির্ভাবের ফলে যদি পুরনো সক্রিয় অবতেজক ক্ষমতা অর্থাৎ আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মপ্রত্যয়ের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে তাহলে উত্তেজনাপ্রবণ মনে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এক কথায় নতুন পরিবেশে অভ্যস্ততা শুধু নার্ভতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ গুণের উপরই নির্ভর করে না, বহুল পরিমাণে নির্ভর করে পুরনো ও নতুন পরিস্থিতির তুলনামূলক বিশ্লেষণের উপরও। আবার এও মনে করা ভুল যে মানুষের বহু উচ্চতর স্নায়রিক সক্রিয়তা-জনিত অভ্যাস (বিশেষতঃ অবতেজন ক্ষম মনে স্বাভাবিক নিষ্ক্রিয়তার ফলে) আপনা আপনি জন্মায় (passive nature); এজন্য প্রাক্তন অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কতকটা সক্রিয় প্রয়াসও আবশ্যক।

এ সকল কারণে পাভলভ মানুষকে স্নায়বিক সক্রিয়তা-হিসেবে শ্রেণী বিভাগ কালে দুটি বিশেষ প্রকৃতির উল্লেখ করেন। তাদের একটি হচ্ছে মস্তিষ্ক ও অধস্তন অংশগুলির এক অন্যের সক্রিয়তা-সংশ্লিষ্ট বিশেষত্ব এবং অপরটি হচ্ছে, প্রথম ও দ্বিতীয় সংকেততন্ত্রের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার বিশেষত্ব।

গ্রীক চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক হিপোক্রেটিস্ বিভিন্ন মনোবৃত্তি অনুসারে মানুষকে (১) বিমর্ষ (melanchoic), (২) রগচটা (choliric), (৩) আত্মপ্রতিষ্ঠ (phlegmatic) এবং (৪) আশাবাদী (Sanguine) এম্নি নানা শ্রেণীতে ভাগ করে গেছেন।

৩৫ বছর আগে (১৯২৭) পাভলভ বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে হিপোক্রেটিস বর্ণিত এই সকল শ্রেণীর নার্ভতন্ত্র এবং ফলে মনোবৃত্তির কার্যকারণ-সম্বন্ধের বিবরণ দেন। প্রায় দু'হাজার বছরের ব্যবধানে জন্মেও দুই দ্রষ্টা ও বিজ্ঞানীর কী অপূর্ব ভাব ও ধারণার সামঞ্জস্য! পাভলভের মতে 'বিমর্ষ' শ্রেণীর নরনারীদের নার্ভতন্ত্রে নিস্তেজনারই প্রাধান্য। তাইতে এরকম ব্যক্তির জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনাই এমন প্রভাব সৃষ্টি করে, যাতে কোন কিছুর উপরই তার বিশ্বাস থাকে না। তার ভবিষ্যৎ নৈরাশ্যময়, জীবন তার কাছে বিষাদে পূর্ণ এবং সবকিছুর বিরুদ্ধেই তার অভিযোগ ও নালিশ থাকে। 'রগচটা' লোকেরা হয় ঝগড়াটে কামাসক্ত এবং সহজে খুব তাড়াতাড়ি উত্যক্ত হয়ে উঠে। এদের নার্ভতন্ত্র স্বভাবতই উত্তেজনা-প্রবণ বলে পাভলভ এ শ্রেণীর লোককে "উদ্দাম" নামে অভিহিত করেন। "আত্মপ্রতিষ্ঠ" শ্রেণীর লোকেদের নার্ভতন্ত্র হয় সুস্থ, অচঞ্চল। এরা শান্ত ও সমাহিত। তারা আত্মকেন্দ্রিক এবং শান্ত, অধ্যবসায়ী ও দৃঢ়পরিশ্রমী। "আশাবাদী" তাঁরাই, যারা উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে সাফল্য লাভ করে, যতক্ষণ কাজ হয় পছন্দমত ও অগণিত—অর্থাৎ তাদের পক্ষে সর্বদাই বহিরাগত উত্তেজনার সঞ্চার আবশ্যক। যখন এরূপ কাজের অভাব ঘটে তখনই তারা ত্যক্তবিরক্ত হয়ে ওঠে এবং আলস্যে গা ঢেলে দেয়।

মানসিক হাসপাতালগুলিতে রোগীদের পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে অতি শান্ত ও সমাহিত শ্রেণীর লোকেদের নার্ভতন্ত্রও অত্যধিক মানসিক ক্রিয়ার চাপ হতে মুক্ত নয় এবং সে কারণেই তাদের সাময়িক কিংবা

দীর্ঘস্থায়ী অস্বাভাবিকতা ঘটতে পারে। পাভলভ একটি প্রবন্ধে লেখেন, "যত বড় শক্তিশালী পুরুষই হোক না কেন, অবশ্যই তাদের মধ্যেও মানসিক বৈকল্য দেখা যেতে পারে, কারণ তাদের অনন্যসাধারণ জীবন যাপনের শক্তি কখনো অসীম হতে পারে না।" ক্রমাগত প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখী কাজ করতে করতে জীবনব্যাপী অসুবিধা ভোগের ফলে মস্তিষ্কের কোশগুলির মধ্যেকার উত্তেজক উপাদান কমে যেতে পারে। ফলে নিস্তেজনা আধিক্য-ঘটতে পারে। এ অবস্থার ক্রম পরিবর্তন হতে পারে, ফলে অধিকতর অবতেজনায় (কিংবা কখন-সখন মন্দের ভাল) একই অবস্থায় তা অপরিবর্তিত থেকে যায়।

১৯৩৫ সালে মনোব্যাধি চিকিৎসক ক্রেট্‌শ্‌মার যে ভাবে শ্রেণীবিভাগের নির্দেশ করেন, তাই তৎকালে একরকম সর্বসম্মতভাবে বিজ্ঞানীদের অনুমোদন ও সমর্থন লাভ করে। এ শ্রেণীবিভাগ অনুসারে বর্ণিত সাইক্লোথাইমিক শ্রেণী অনেকটা পাভলভের মতে "উদ্দাম" নার্ভতন্ত্র সম্পন্ন এবং "শিজোথাইমিক শ্রেণী" দুর্বল এবং উত্তেজনাহীন নার্ভতন্ত্রের অধিকারী। প্রথম শ্রেণীর লোকেদের কোন কিছুকেই সামান্য ভাবা সম্ভবপর নয় এবং সে কারণে তাদের মনে কোনো সময়ে শান্তি থাকে না ও তাদের নার্ভতন্ত্রে নিস্তেজনা কম। তারই ফলে উত্তেজক ক্রিয়া মস্তিষ্কের স্বাভাবিক সহের সীমা অতিক্রম করে যায় ও আনুষঙ্গিক বৈকল্য ঘটায়। আবার দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা স্বভাবতঃ দুর্বল চিত্ত বলে কী ব্যক্তিগত কী সামাজিক সংকটের যথাযথ সমাধানের ক্ষমতার অভাবে মানসিক রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ক্রেট্‌শ্‌মারের মতে এ সকল স্থলে নার্ভতন্ত্রের অস্বাভাবিকতার জন্য দায়ী তার জন্মগত এবং বংশগত দুর্বলতা, কিন্তু পাভলভ বলেন, তার চেয়েও অধিক দায়ী শিশুকাল হতে পাওয়া শিক্ষা, দীক্ষা ও অভিজ্ঞতা। কিন্তু পাভলভের মতে এদের কোনটিই মানসিক রোগের পর্যায়ে পড়ে না, কেন না তাঁর ধারণা যে এগুলি স্বাভাবিক নার্ভতন্ত্রের প্রশস্ত গণ্ডির মধ্যেই পড়ে, ঐ গণ্ডির মধ্যে এ দু'টি শ্রেণী দুই প্রান্ত সীমানায় অবস্থিত মাত্র।

পাভলভের মতে মানুষের মধ্যে দুটি সুস্পষ্ট শ্রেণী দেখা যায়, শিল্পী (artists) দার্শনিক (thinkers)। লেখক, গায়ক, চিত্রকর প্রভৃতি যাঁরা সব কিছুর মধ্যে একটা পূর্ণ সামগ্রিক রূপ দেখতে পান, তারা সকলেই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু যাঁরা প্রথমে সব কিছুকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো বিশ্লেষণ করে, আবার তাদের যথাস্থানে বসিয়ে জোড়া দিতে গিয়ে বিফল হন তারাই হলেন দ্বিতীয় শ্রেণী। প্রথম শ্রেণীর মস্তিষ্ক প্রথম সংকেত তন্ত্রের ক্রিয়াই মুখ্য এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর মস্তিষ্কে দ্বিতীয় সংকেততন্ত্রেরই প্রাধান্য। মনে রাখা দরকার এই দুই শ্রেণীর মানুষের সংখ্যা অর্থাৎ বিশেষভাবে শিল্পী ও বিশেষভাবে দার্শনিক মনের সংখ্যা খুব বেশী নয়। উভয়তন্ত্রের সমতাবিশিষ্ট মাধ্যমিক শ্রেণী যাদের মধ্যে বিভিন্ন পরিমাণে শিল্পীমন ও ভাবালুতার সংমিশ্রণ দেখা যায় তাদের সংখ্যাই বেশী। তুলনামূলকভাবে মানব মনের সুস্থতা ও সাময়িক বা চিরস্থায়ী বিকারের কারণ বুঝতে হলে পাভলভের মতবাদকে ভিত্তি করেই বুঝতে হবে। তিনি যে শুধু মানসিক হাসপাতালে রোগীদের লক্ষণসমূহ লক্ষ্য করে এবং তাদের রোগের ইতিহাসের সঙ্গে লক্ষণগুলির কার্যকারণ লক্ষ্য করেই এ মতবাদ প্রচার করেছেন এমন নয়. নিজের গবেষণাগারে কুকুরদের উপর অনুরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা, তাদের মধ্যেও একই প্রকারের মনোবিকলন ঘটাতেও সক্ষম হয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন (১৯৩১), "আমার স্থির বিশ্বাস যে মনোবিকলনের কারণ, শ্রেণীবিভাগ, সংঘটন-পদ্ধতি এবং উপযুক্ত চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় সমস্যাগুলির সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সমাধান বা বহুলাংশে সমাধানের সাহায্যের জন্য গবেষণাগারে জন্তুজানোয়ারদের উপর নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা অত্যাবশ্যক।

বারান্তরে এ সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে।

পৃথিবীতে প্রাণের সূচনা

জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

ভাববাদিরা পৃথিবীতে প্রাণের প্রথম সূচনার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছেন অনেক। আর সেই সব আলোচনার রহস্যঘন ধূম্রজালে বিজ্ঞান হয়ে উঠেছে বাইবেলধর্মী রহস্যোপন্যাস। গত শতাব্দীর শেষ দশকেও বহু বিশিষ্ট জীববিজ্ঞানী মনে করতেন যে প্রাণ পৃথিবীতে এসেছে আকস্মিক ভাবে ; তার মূলে যে বিবর্তনের প্রয়োজন, এ কথা তাঁরা ভাবতেও পারতেন না। তাই যদি বিশ ত্রিশ বছর পূর্বেও "পৃথিবীতে প্রাণের সূচনা" এই প্রশ্নের উপর কোন আন্তর্জাতিক সম্মেলন ডাকা হত তবে তা এক ধর্ম ও দর্শণের আন্তর্জাতিক সম্মেলনেই পর্য্যবসিত হত। কিন্তু আজ অবস্থার গুরুতর পরিবর্তন হয়েছে। মস্কোর এ, এন, বাখ ইনষ্টিটিউট অব বায়োকেমিষ্ট্রির এ, আই, ওপেরিন ও তাঁর নিরীক্ষাশালায় প্রাণের সূচনার প্রশ্নটি নিয়ে অনেক কাজ হয়েছে। ওপেরিনের কাজের মূল সূত্রগুলিকে নিয়ে যে গ্রন্থটি (১) প্রকাশিত হয়েছে তা অনেকে দেখে থাকবেন। ওপেরিনের এই কাজগুলি পৃথিবীর সর্বত্র অকুণ্ঠ সমাদর পেয়েছে।

মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে মস্কো সহরে "পৃথিবীতে প্রাণের প্রথম সূচনা" এই বিষয়বস্তুর উপরে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত দুই বৎসর হ'ল এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আলোচিত তথ্যগুলির একটি সঙ্কলন (২) আমাদেব হাতে এসেছে। এই তথ্যগুলির সবকিছু আলোচনা করা কয়েকটি প্রবন্ধে ও সম্ভব নয়। তা ছাড়া বর্তমান প্রবন্ধকার ঠিক অনুরূপ বিষয়ের গবেষণায় লিপ্ত না থাকায় এই প্রসঙ্গে আলোচনা কিছুটা সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য। তবে একাধিক নিবন্ধে এই বিষয়বস্তুর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

উপরোক্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধন করতে গিয়ে ওপেরিন বলেন যে, এখনই মাত্র সময় এসেছে যখন "পৃথিবীতে প্রাণের প্রথম সূচনা" নিয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনা করতে পারি। এখন বিভিন্ন দেশের একাধিক বীক্ষণাগারে এই প্রশ্নের সমাধান সূচক নিরীক্ষা সুরু হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে অজস্র বক্তা এই প্রশ্নের বিভিন্ন দিকে তাঁদের কাজ কর্মের বিবরণ দেন। তাই অনুষ্ঠান সমিতি কাজগুলিকে বিভিন্ন বিভাগে বিন্যস্ত করেন। মোট সাতটি অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়।

প্রথম অধিবেশনে পৃথিবীতে প্রাথমিক জৈবরাসায়নিক পদার্থের আবির্ভাব ছিল আলোচ্য, ইউরি, বার্ণেল, লেভিন পিরি প্রমুখ রাসায়নিক ও পদার্থ বিজ্ঞানীরা এই অধিবেশনে তাঁদের প্রবন্ধাবলী উপস্থাপিত করেন। ফ্লরকিন এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন বার্ণেল। এই অধিবেশনের আলোচ্য ছিল প্রাথমিক জৈবরাসায়নিক পদার্থের বিবর্তন ও সমাবর্তন। মিলার, টেরেনিন, আকাবরী প্রমুখ বিজ্ঞানীরা প্রবন্ধ পাঠ করেন ও আলোচনা করেন।

তৃতীয় অধিবেশনটি ছিল প্রোটিন, নিউক্লিও প্রোটিন ও জৈবিক অনুঘটকের (enzyme) আবির্ভাব

ও বিবর্তন নিয়ে। চেন এই অবিধেশনে সভাপতিত্ব করেন। আকাবরী, কেলভিন, পলিং, সিঞ্জ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকবৃন্দ এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

চতুর্থ অধিবেশনটি তৃতীয় অধিবেশনের বিষয়বস্তু নিয়েই চলে ও এতে পৌরহিত্য করেন আকাবরী। মিরস্কি, ব্রাজে, ওপেরিন প্রমুখ অনেকে আলোচনা করেন ও প্রবন্ধ পাঠ করেন।

'সংগঠনের' বিবর্তন—এই ছিল পঞ্চম অধিবেশনের আলোচ্য। বার্ণেল, ওপেরিন, লেপসেনস্কায়া প্রভৃতি এই অধিবেশনে যোগ দেন।

বিপাকীয় (metabolism) বিবর্তন—এই ছিল ষষ্ঠ অধিবেশনের বিষয়বস্তু। এই প্রসঙ্গটিই সপ্তম অধিবেশনেও আলোচিত হয়।

অধিবেশনের বিষয়বস্তুর বিভাগ ও বিন্যাস থেকে একটি জিনিস সুস্পষ্ট। প্রাণ বিকাশের জন্য ভূতাত্ত্বিক ক্রমবিকাশ থেকে সুরু করে আজ আমরা জীবনের যে রূপে অভ্যস্ত, অধিবেশনের বিভিন্ন পর্য্যায়ে ক্রমবিবর্তনের ধারাক্রমে এই আলোচনাগুলিকে উপস্থাপিত করা হয়।

এই অধিবেশনে আলোচিত বিষয়বস্তু নিয়ে ভবিষ্যতে ধারাবাহিক আলোচনা করব। সেই সূত্রে বর্তমানে প্রারম্ভিক শুধু একটি বিষয়েরই অবতারণা করব।

আজ আমরা প্রাণ যে রূপে দেখছি বহু হাজার কি লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর প্রথম আবির্ভূত প্রাণের কি এই স্বরূপ ছিল? তার আগে বলা দরকার আজকের প্রাণের স্বরূপ কি? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব সহজ নয়। তবে পিরির (৩) সংজ্ঞা অনুসরণ করলে হয়ত প্রশ্নটি বুঝতে সুবিধা হবে। পিরির সংজ্ঞা হল, "আত্ম বিলোপরক্ষী (self perpetuation) সংস্থা যেখানে অঙ্গারগর্ভী (জৈব) অনুঘটক (catalyst) রূপ পেয়েছে": তাই হল প্রাণের বর্তমান রূপ। বাস্তবিক এই জৈবিক অনুঘটকের (Organic-catalyst-enzymes) রূপ পরিগ্রহই প্রাণের রূপ গ্রহণ। অজৈবিক অনুঘটক (Inorganic) রসায়নের কোন বিস্ময় নয়। তার একাধিক উদাহরণ বর্তমান। কিন্তু জৈব অনুঘটকের (organic catalysts) বিশেষত্ব আছে। অঙ্গার দীর্ঘ সূত্রী অণু তৈরী করতে সক্ষম। জলের বা অনুরূপ অজৈবিক অণুর তুলনায় অঙ্গারের তৈরী এই সব দীর্ঘসূত্রী অণু (long chain molecules) বহু হাজার গুণ বড় ও ভারী হতে পারে। জৈব অনুঘটক, এই সব দীর্ঘসূত্রী অণু সংগঠিত বা ভঙ্গ করতে সক্ষম। এই সব দীর্ঘসূত্রী অণুর ভাঙ্গাগড়া সহজসাধ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর সংগঠনের কাঠামো প্রকৃতির হস্তগত হ'ল। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার (quantum mechanics) ভাষায় বলতে পারা যায়, যে এই সাংগঠনিক বিবর্তনের ফলে শক্তি ব্যবহারের আরও কয়েকটি ধাপ দ্রুত অতিক্রম করা অনুরূপ সংগঠনের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠল।

প্রথম প্রাণের সূচনা যে পরিবেশে হয়েছিল, তার কথা একবার ভাবা যাক। সেই পরিবেশ (environment) ছিল বর্তমান জৈবিক পরিবেশের তুলনায় অনেক সরল। কিন্তু সরল হলেও তার শৃঙ্খলার মান ছিল অনেক কম (high entropy) আর তা ছিল বলেই সংখ্যাতীত রকমের রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটা সম্ভব ছিল। এরই ফলে কোন কোন আকস্মিক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রী অণু গঠন সম্ভবপর হয়ে উঠল।

দীর্ঘ সময় নিয়ে, স্বল্প শৃঙ্খলার পরিবেশে, বৃহত্তর অণুর সংগঠন সম্ভব হয়েছিল, এ কথা আমরা ভাবতে পারি। কিন্তু প্রোটিনের অণু, যা একটি রাসায়নিক বিস্ময়, তা যে ঠিক কি করে উৎপন্ন হল তা

আজও আমাদের গবেষণার বিষয়। বার্ণাল (৩) মনে করেন যে এই জটিল অবস্থার সূচনা হওয়া সম্ভব ছিল একমাত্র কর্দমানুরূপ অবস্থায়। তাই বার্ণালের মতে প্রথম জীবন, কিম্বা প্রথম প্রোটিন জাতীয় পদার্থের, সূচনা হয়েছিল প্রাথমিক নদীগুলির সাগরসঙ্গমে, যেখানে কর্দমজাতীয় বস্তুর প্রাচুর্য্য ছিল। এই মতবাদ সমীচীন মনে হয়, কারণ আজও আমরা দেখতে পাই জীবকোষের অনুবর্তী জলীয় পদার্থের সমুদ্রের জলের সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য। জীবকোষের বহিরস্থ জলীয়াংশে পটাশিয়াম বেশী আছে, প্রায় যে পরিমাণে সমুদ্রের জলে থাকে।

বলা বাহুল্য প্রোটিনের সংগঠন এককভাবে ঘটেনি। তার সঙ্গে বিবর্তনের গতিপথে, শর্করা, ফসফেট, পিউরিন ও পিরামিডিন অণুর বিবর্তনও ঘটে থাকবে। এই পদার্থগুলির সূচনার ফলে নিউক্লিক এসিডের বিবর্তন সম্ভব হল। আত্মসৃজন ধর্মী (self duplicating) জৈবপদার্থ, তাই আজ এই পদার্থগুলিকে বাদ দিয়ে আর ভাবা যায় না।

প্রকৃতির সৃষ্টির যজ্ঞশালায় প্রোটিন এসেছে বহু অপেক্ষা ও বহু রাসায়নিক বিকল্প সংযোজনের ফলে। তাই প্রোটিন সৃষ্টি হতে সময় লেগেছে অনেক। প্রোটিন সৃষ্টি হতে যে সময় লেগেছে, তার চেয়ে অনেক বেশী সময় লেগেছে স্নেহ পদার্থের (fats) আবির্ভাবে। স্নেহপদার্থ জলে দ্রাব্য নয়। তাই স্নেহপদার্থ দিয়ে জলকে দূরে রাখা সম্ভব। স্নেহ পদার্থ আসার সঙ্গে সঙ্গে, প্রাথমিক প্রাণী তার জলীয় আবহাওয়া থেকে নিজেকে অন্তরিত (insulate) করতে পারল। এই অন্তরাল সৃষ্টি জৈবিক বিবর্ত্তনকে বিশেষভাবে সাহায্য করল। পরিবেশ থেকে নিজেকে অন্তরালে রাখা, অথচ পরিবেশকে ব্যবহার করতে পারায়, প্রাণী পরিবেশ থেকে তার খাদ্যসম্ভার গ্রহণ করতে লাগল, ও পরিবেশের মধ্যে তার রেচকপদার্থকে অভিক্ষেপ করতে লাগল। জীবকোষের সীমান্তে আজও আমরা দেখি স্নেহদ্রাবক পদার্থ। একদিন প্রাথমিক প্রাণী নিজেকে অন্তরিক করার জন্য যে স্নেহপদার্থ ব্যবহার করেছিল, আজও তার অবশেষ (remnant) দেখা যায় প্রতিটি জীবকোষে।

পরিবেশ ও পরিবেশ অন্তরালে এক আত্মপরিবেশ প্রাণীমাত্রেই সৃষ্টি করে থাকে ঐ প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা কিছু আলোচনা করলাম। পরিবেশের কথাতে আমাদের একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন তা হল এই : ১৯১৩ সনে প্রকাশিত এক পুস্তকে (৪) হেণ্ডারসন প্রথম দেখান যে আজ আমরা প্রাণকে যে পরিবেশের মধ্যে দেখছি সেই পরিবেশটিও প্রাণের পক্ষে অপরিহার্য ও অনবদ্য। কথাটা একটু পরিষ্কারভাবে বলার চেষ্টা করা যাক। আজকের জৈবিক পরিবেশে আছে ; জল, অঙ্গার (carbon), হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন। পরিষেশ সৃষ্টির পক্ষে এদের বিশেষ অনবদ্য ভূমিকা ও অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য।

প্রথমেই ধরা যাক জলের কথা। প্রত্যেক প্রাণীর আত্ম পরিবেশ গঠনে প্রায় ৯০ ভাগই জল। জলের মধ্যেই দ্রব বা অদ্রব অবস্থায় প্রাণীর ব্যবহার্য সমস্ত পদার্থ কোষের মধ্যে থাকে। শুধু জলজ বা স্থলজ প্রাণী সম্বন্ধেই কেবল এ কথা প্রযোজ্য নয় ; খেচর প্রাণীদের সম্বন্ধেও ওই এক কথা। জলের মত বিশ্বগ্রাসী দ্রাবক পদার্থ আর আছে বলে জানা যায় না। প্রাণীর যে যে পদার্থের আবশ্যক হ'ক না কেন, জলে বিগলিত করে প্রাণী তা আত্মসাৎ করতে পারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে জলের এই গুণটি অনবদ্য।

আমরা জানি প্রাণীর তাপসহনশীলতা সীমাবদ্ধ। অতি উচ্চ তাপ বা অতি নিম্নতাপ জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর। জলের এই গুণটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে জল জমে যায়। ও ১০০

ডিগ্রীতে তা বাষ্পীভূত হয়। জলের এই গুণটি গুরুত্বপূর্ণ, এ কথা বলার আরও কারণ আছে। বৈজ্ঞানিক পলিং (৫) দেখিয়েছেন যে, পদার্থ রসায়নের (Physical chemistry) নিয়ম অনুযায়ী জলের বাষ্পীভবন ও দ্রবণের তাপমাত্রা অনেক নিচে হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু হাইড্রোজেন সংযোগমাত্রার (Bond) কল্যাণে জল এই অনবদ্য গুণের অধিকারী হয়েছে।

জলের আর একটি বিশেষ গুণ হল জলের তাপগ্রহণ ক্ষমতা (Heat capacity)। অর্থাৎ অন্য যে কোন বস্তুকে এক ডিগ্রী উত্তপ্ত করতে যে পরিমাণ উত্তাপ প্রয়োজন জলকে এক ডিগ্রী উত্তপ্ত করতে তার চেয়ে বেশী উত্তাপের প্রয়োজন। আমরা জানি প্রাণীকোষে জলের পরিমাণ ৮০-৯০ ভাগ। জলের এই বৈশিষ্ট্য শৈত্য ও উত্তাপকে কিয়দংশে নিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম। প্রাণীকে শীতগ্রীষ্মে বহির্জগতের সঙ্গে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা দিয়েছে কতকাংশে এই জল।

জলের আর একটি বিশেষ গুণ এই যে জলই একমাত্র বস্তু যা কঠিন অবস্থায়, অর্থাৎ বরফ অবস্থায় হাল্কা হয়ে যায় ও জলে ভাসে। বরফ জলে ভাসার ফলে তলাকার জলের তাপমাত্রা বিশেষ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না। প্রাণিজগতের পক্ষে এ এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

নদী, হ্রদ, সমুদ্র ইত্যাদিতে উপরের জল জমে গেলেও, নিচের জল তরল থাকে। এই কারণেই তুষারযুগের মাঝখান দিয়েও প্রাণের অবিচ্ছিন্ন ধারা, ক্রমবিবর্তনের পথে অগ্রসর হতে পেরেছিল।

জলের অনবদ্য দ্রাবকশক্তির কথা বলা হয়েছে। জল শুধু দ্রাবকশক্তিরই অধিকারী নয়। জলে দ্রবীভূত অণুগুলি, ক্ষুদ্রতর আয়নাংশে বিভক্ত হতে পারে। তাই প্রাণীর পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলো অনেক সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। অন্য কোন দ্রাবক তরল পদার্থে এই সুবিধাগুলো নেই।

হাইড্রোজেনের বৈশিষ্ট্যও আলোচনার যোগ্য। প্রথমেই বলা যায় হাইড্রোজেনের পরমাণু সব চেয়ে ছোট ও হাল্কা। অক্সিজেনের সঙ্গে গাঁথা হয়ে ও অন্য পরমাণুর সঙ্গে রাসায়নিক গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে হাইড্রোজেন যদি আটক পড়ে না যেত, তবে হাল্কা হবার জন্য পৃথিবীর আবহাওয়া থেকে সমস্ত হাইড্রোজেন উড়ে চলে যেত। প্রাণের সূচনা আর সম্ভব হতনা।

হাইড্রোজেনের সব চেয়ে বড় গুণ হল, যে তা অজস্র রকমের পরমাণু তৈরী করতে পারে। দুটি পরমাণুর মধ্যে সামান্য একটু জায়গা থাকলেই, হাইড্রোজেন তার মধ্যে ঢুকে, একটি নতুন অণু তৈরী করতে পারে।

হাইড্রোজেনের আরও একটি গুণ হল এই যে, তা বিভিন্ন ধরনের পরমাণবিক সংযোগসূত্র (Bond) করে। এই সংযোগ সূত্রগুলির মধ্যে একরকম সংযোগসূত্র খুবই সহজে বিচ্ছিন্ন হতে পারে। এরই ফলে বহু প্রকারের রাসায়নিক প্রক্রিয়া, বিশেষ করে অণুঘটকের কার্য্যক্রম অনেক জায়গায় সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। প্রাণীর পক্ষে এ এক অতি সুবিধাজনক অবস্থা।

অঙ্গারের সম্বন্ধেও কিছু বলা প্রয়োজন। অঙ্গার অণুর চারদিকে চারটি সংযোগ সূত্র থাকার ফলে, তা অজস্র রকমের পরমাণু সৃজনে সক্ষম। এমন কোন বস্তু নেই, যা এত অজস্র রকমের অণু তৈরী করতে পারে। অঙ্গারই মাত্র একটি মৌলিক পদার্থ যা দীর্ঘসূত্রী অণু গঠন করতে পারে। আর দীর্ঘসূত্রী অণু গঠন সম্ভব হওয়ায় প্রাণীদের যে রূপে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাদের সংগঠনও সম্ভব হয়েছে।

অঙ্গারের আর একটি গুণ হল যে তা অতি কঠিন আবার অতি নমনীয় সংযোগসূত্র গঠন করতে পারে। তার ফলে এমন পরমাণু গঠন করা সম্ভব, যার কোন কোন অংশ সহজেই বিচ্ছিন্ন সম্ভব। অণুঘটকের কাজ এতে আয়াসসাধ্য হয়েছে।

অক্সিজেনের কথা আলাদাভাবে না বললেও জলের গঠনে, অক্সিজেনের উপস্থিতি অক্সিজেনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথা মনে করিয়ে দেয়।

জগতে প্রাণের প্রথম স্চনার কথা একটি প্রবন্ধে বলা সম্ভব নয়। পরে এ নিয়ে আরও আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

গ্রন্থপঞ্জী

১। A. I. oparin : The origin of Life on Earth Izd. Acad. S. S. S. R. Moscow, Leningrad 2nd . Ed. 1941.

২। Oparin A. I. editor : The origin of Life on Earth Proccedings of the Symposium held in Moscow 1957 : 1959.

৩। Bernal. J. D : The Physical Basis at Life. London : Routledge 1951.

৪। Henderson L. F. : The Fitness at the Environment : Mcmillan. New York. 1913.

৫। Pauling L. : The Nature of chemical Bond : Ithaca. Cornell university Press. 1961.

'মানব মনের ক্রমবিকাশ'**

(১)

মনোবিদ

মানবমনের ক্রমবিকাশের আলোচনায় অনিবার্যভাবে দুটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। প্রথমঃ পশুমন থেকে মানবমনের বিবর্তন ; দ্বিতীয়ঃ শিশুমন থেকে বয়স্ক-মনের সংগঠন। এই দুই প্রশ্নের মীমাংসা ছাড়া মানসিক ক্রমবিকাশের সমস্যা-সমাধান অসম্ভব। এই প্রশ্ন দুটির মীমাংসা চেষ্টায় পাভলভ ও ফ্রয়েড দুই বিভিন্ন পথে অনুসন্ধান চালিয়েছেন। ফলে ঘটেছে দুই বিপরীতধর্মী মনস্তত্ত্বের গোড়াপত্তন। পাভলভ মস্তিষ্কবিজ্ঞানকে আশ্রয় করে মানসিক জটিলতা ও ক্রিয়াকলাপের ব্যাখ্যা করেছেন, অপর পক্ষে ফ্রয়েড মস্তিষ্ক-বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে তাঁর নির্জ্ঞান-তত্ত্বের বনিয়াদ গড়ে তুলেছেন। ফ্রয়েড (১৯৩৫) মনে করেছেন উচ্চ মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ অপরিজ্ঞাত বা স্বল্প পরিজ্ঞাত। তার সাহায্যে আত্মিক জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়। তিনি বলেছেন—"Have you not noticed that every philosopher, dramatist, novelist, historian, or biographer, arranges psychology for himself, adduces his particular presuppositions as to the interconnections and aims of psychical activity, all more or less pausible and all equally precarious ? There is clearly no common foundation' একটি সর্বজন গ্রাহ্য মনস্তাত্ত্বিক সূত্র প্রণয়নে ফ্রয়েড সারাজীবন চেষ্টা করেছেন এবং তাঁর আবিষ্কৃত নির্জ্ঞানতত্ত্বকে সর্বজনগ্রাহ্য সূত্র হিসাবে বিশ্বের দরবারে পেশ করেছেন। পশুমন থেকে মানবমনের বিবর্তনের ধারাবিচারে ফ্রয়েড নৃতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, ইতিহাস থেকে সেই সব নজীর সংগ্রহ করেছেন যেগুলো তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্তের সঙ্গে খাপ খায়। লোকগাথা ও পৌরাণিক কাহিনীকে আশ্রয় করে, বিশেষ করে রবার্টসন, স্মিথের, বহুলাংশে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত, তথ্যের উপর নির্ভর করে ফ্রয়েড্ তাঁর নির্জ্ঞান-মনতত্ত্বের প্রামাণিক বনিয়াদ (?) গড়ে তুলেছেন। স্মিথের ভুলভ্রান্তি সম্বন্ধে ফ্রয়েড যে ওয়াকিবহাল ছিলেন না এমন নয়। তিনি বলেছেন "I have often been vehemently reproached for not changing my opinions in the later editions of my book (Totem & Taboo), since more recent ethnologists have without exception discarded Roberton Smith's theories and have in part replaced them by others which differ extensively" (Totcm & Taboo 1939 pp 257-58) তবে তিনি মনে করেন কোনো তথ্য বা থিওরি তাঁর মনোমত কিনা অর্থাৎ তাঁর কাজে লাগবে কিনা—এইটেই বড় কথা। সত্যাসত্য বিচারটা বড় কথা নয়। "Above all, however, I am not an ethnologist, but a psycho-analyst. It was my good right to select from eathnoogical data what would serve me for my analytic work"—এও ফ্রয়েডেরই উক্তি। উদ্ভট কল্পনা বলে মনে হলেও তাঁর প্রকল্প এতাবৎ বিচ্ছিন্ন তথ্যপঞ্জীর পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ে সহায়ক বলে ফ্রয়েড দাবী করেন। টোটেম ভোজের মন-সমীক্ষামূলক ব্যাখ্যা থেকে ফ্রয়েড প্রাগৈতিহাসিক সমাজ সম্পর্কে দূরকল্পী এক ইতিবৃত্ত উদ্ভাবন করেন ও বারবার ঐ ধারণার উল্লেখ করে ঐ ধারণাকে ঐতিহাসিক সত্যের মর্য্যাদা

দানের চেষ্টা করেন। প্রাক্ কৌম সমাজ-সম্পর্কিত ফ্রয়েডীয় মতবাদ ইতিহাস-অসমর্থিত হয়েও সাধারণের মধ্যে যথেষ্ট প্রচলিত। টাবু ও টোটেম যুগের পূর্বে দুর্ধর্ষ পিতা ছিলেন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ও গোষ্ঠীর সমস্ত নারীর অধিকর্তা;—বয়ঃপ্রাপ্তরা (পুরুষ) দল থেকে বহির্ভূত। এ সময় মানবমন পশুমনের মতই অসংগঠিত ও অপরিস্ফুট। জ্ঞান নির্জ্ঞানের প্রকোষ্ঠ-বিভক্ত হয়নি তখনও মন, বিবেকের হয় নি উদ্ভব। যা কিছু সংঘাত বাইরের সঙ্গে। মানসিক দ্বন্দ্বঅপরিজ্ঞাত। তারপর একদিন, ফ্রয়েড বলেছেন—বয়ঃপ্রাপ্তরা দল বেঁধে ফিরে এসে পিতাকে হত্যা করে দলের মেয়েদের অধিকার করত আর তৎকালীন নিয়মানুযায়ী পিতৃমাংসের ভোজে পরিতৃপ্ত হত। এই থেকেই ঘটল আদি-মানবের অপরাধ-বোধের সঞ্চার। ইদ্ ইগো ও সুপার-ইগো তিন প্রকোষ্ঠে বিভক্ত হল মানবমন। সেন্সরশিপ বা নিষিদ্ধকরণের বেড়া বসল ইদ্ আর ইগো, ইগো আর সুপারইগোর মধ্যে, হল অবদমনের প্রথম সূত্রপাত। অবদমন ফ্রয়েডীয় মতে মনোজগতের প্রচণ্ড শক্তি।

প্রথম পাপ [পিতৃহত্যা ও পিতৃমাংস ভোজন] থেকে অপরাধবোধের-উৎপত্তি। আর অপরাধবোধ থেকে গোষ্ঠীজীবনে ক্রমশঃ অবদমনের প্রসার। সহজাত প্রবৃত্তিমূলক কামনা-বাসনার আনুষ্ঠানিক পরিত্যাগ থেকেই মনের ক্রমোন্নয়ন ও জটিলতাবৃদ্ধি। আগুনের আবিষ্কার ও ব্যবহারের মধ্যেও ফ্রয়েড খুঁজে পেয়েছেন প্রবৃত্তিমূলক যৌনবাসনা-অবদমনের ইতিহাস। প্রমেথিয়ুস-কাহিনীর ফ্রয়েডিয়ান ব্যাখ্যা কবিদের বিশেষ প্রেরণা জুগিয়েছে। ফ্রয়েড বলেছেন, লোকগাথা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান যে অগ্নির আকাশচুম্বী লেলিহান জিহ্বোপম শিখা লিঙ্গ-প্রতীক [phallic symbol] বলে অনুভূত হত আদিম মানুষের মনে। "Putting out fire by urinating therefore represented a sexual act with a man, an enjoyment of masculine potency in homosexuad rivalry……By curbing the fire of his own sexual passion he was able to tame fire as a force of nature. This great cultural victory was thus a reward for refraining from the gratification of an instinct. Further it is as if man had placed woman by the hearth as the guardian of the fire he had taken captive, because her anatomy makes it impossible for her to yield to such a temptation." (Civilisation ~~to~~ and its Discontents pp 50-51).

সভ্যতার ইতিহাস [ফ্রয়েডীয় মতে] আদিম-প্রবৃত্তির অবদমনের ইতিহাস, আত্মকৃচ্ছ্রতার ইতিহাস। এর পরিণাম কি? একদিকে নির্জ্ঞান প্রবৃত্তি-সর্বস্ব ইদ প্রতিটি অবদমনের ফলে, অবদমিত মননশক্তির আধার হিসেবে বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরস্থ তরল লাভাস্রোতের মত নিয়ত নির্গমন প্রচেষ্টায় চঞ্চল অস্থির অবদমিত কামনা-বাসনার লীলাভূমি হয়ে ওঠে নির্জ্ঞান মন। ফ্রয়েডের ভাষায়—"a chaos, a cauldron of seething excitement। আনন্দ ও তৃপ্তি লাভের অদম্য স্পৃহায় স্বততঃ স্পন্দিত হতে থাকে মনের গুহা—মনের শক্তিশালী এই নির্জ্ঞান প্রকোষ্ঠ। সমাজে যত অগ্রগতি ঘটে, সভ্যতার যত প্রসার ঘটে, তত বেশী ঘটে অবদমন আর ইদের শক্তিবৃদ্ধি। ইদের রাজ্যে কোনো লজিকের বালাই নেই। সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী প্রেরণাসমূহ--পরস্পরের প্রতিরোধক নয়, প্রতিদ্বন্দ্বীও নয়, তারা পাশাপাশি অবস্থান করে নির্গমনের সুযোগ খোঁজে। "In the Id there is nothing corresponding to the idea of time, no recognition of the passage of time and no alteration of mental process by the process of time………impressions which have been pushed down into the id are virtually immortal."—আদিম বাসনা অমর ও স্থানকালের অতীত। Naturally the Id knows no values, no good, no evil, no morality……Instinctual cathexes seeking discharge, that, in our view, is all that the id contains (New Industry Leches pp 104-5). সভ্যতা ও সংস্কৃতি সহজাত প্রবৃত্তির কেতলির ওপর যত জোরে ঢাকনি বসাতে চেষ্টা করে—কেতলির ভিতরকার বাষ্পচাপ ততই বাড়তে থাকে। এই হচ্ছে ইদের ইতিহাস। বাইরের জগতের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হতে থাকে মনের যে-প্রকোষ্ঠে তাকে বলা হল ইগো। ইদেরই একটি অংশ ইগোতে রূপান্তরিত হয়—আদিম সমাজের ক্রমোত্তরণের মধ্য দিয়ে। ইদ উদগ্র প্রবৃত্তি সমূহের প্রতিনিধি আর ইগো জ্ঞানবুদ্ধির প্রতীক। ইদের উদ্দেশ্য ও অভিলাষ আত্মতৃপ্তি—ভালমন্দ, ন্যায় অন্যায়ের বিচার না করে, যে-কোন উপায়ে আত্মসুখ লাভের জন্য চলেছে ইদের প্রচেষ্টা। আর ইগো বাস্তবধর্মী—জ্ঞানবুদ্ধির প্রয়োগাভিলাষী। ইগো কিন্তু শক্তিহীন কাজেই নিরুপায়, তাকে অনেক সময়েই ইদের অভিলাষানুযায়ী চলতে হয়। ইগোর কাজ খুবই কঠিন। আদিম সহজাত প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা আবার অবদমিত অভিলাষকে অবদমিত রাখা। মারীচের মত তার অবস্থা। আদিম সমাজের টাবু সংরক্ষণ করতে হবে আবার প্রকৃতির দাবীও তাকে মানতে হবে। এই টানা হ্যাঁচড়ার ফলে ইগো ভেঙ্গে হল দু টুকরো, [অবশ্য এর মধ্যে সভ্যতার পদক্ষেপে আরও অবদমন ঘটেছে, আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে ইদ] খাঁটী ইগো ও সুপার ইগো বা বিবেক। এইভাবে মনের তৃতীয় প্রকোষ্ঠের সৃষ্টি। সুপার ইগো মূলতঃ অবদমন-সঞ্জাত হলেও পরবর্তীকালে হয়ে দাঁড়ায় অবদমনের অধিকর্তা। ফ্রয়েডের সামাজিক ও মানসিক উন্নয়ন শক্তির উৎস এই সুপারইগো। প্রথমে টাবুর ; পরবর্তীকালে হয়ে দাঁড়ায় ধর্মীয়, সামাজিক ও নৈতিক আচার-ব্যবহারের আধার। সুপার ইগোর নির্দেশে ইগো ইদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। ইগো বেচারার দুর্গতি এই পর্যায়ে আরও বেড়ে ওঠে। ফ্রয়েডের কথায়—ইগোকে এখন তিন প্রভুর মনোরঞ্জন করতে হয়। ইদ আর বহির্জগৎ ত' ছিলই—এখন নতুন প্রভু সুপারইগোর আবির্ভাব ঘটল। তিন কর্তার তিন রকমের হুকুম ; তিন জনই সমান কড়া আর জবরদস্ত। বেচারা ইগো!

এত গেল বর্বর যুগের কথা। এর পর সভ্যতার সূত্রপাত। সংঘ-গোষ্ঠী কেন্দ্রিক সমাজ ক্রমশঃ বিবর্তিত হতে হতে সভ্যসমাজে রূপান্তরিত হয় : মানুষের মনে কিন্তু সেই প্রাচীন উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত গুণাগুণ থেকেই যায় : বললেন ফ্রয়েড। আদিম মনের প্রবৃত্তি, তৎসংশ্লিষ্ট স্মৃতি, আবেগ, অনুভূতি ক্রমশ জমতে থাকে নির্জ্ঞান মনের গোপন গুহায়।

আদিম অনুভূতি ও প্রবৃত্তি নির্জ্ঞান মনের ইদ ও সুপারইগো দুই অংশেই জন্মাবধি বিদ্যমান। ফ্রয়েডের মতে অজাচার ইচ্ছা (incest) নির্জ্ঞান ইদের স্বভাবধর্ম আর নির্জ্ঞান সুপার-ইগোর স্বভাবধর্মে অজাচার নিষিদ্ধ টাবু। সভ্য-মনের বিশেষত্ব এই বিপরীতধর্মিতা অর্জিত নয়, জন্মসূত্রে প্রাপ্ত ও ক্রম-অবদমনের ফল। সভ্যমানুষ যুগপৎ ভালবাসে ও ঘৃণা করে। আধুনিক গল্পে উপন্যাসে এই বিশেষ বিপরীতধর্মিতার নিদর্শন প্রচুর। আদিমযুগের পিতৃবিদ্বেষ আজকের সন্তানে বিদ্যমান আবার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে পিতৃহত্যার অপরাধজনিত গ্লানি তদ্দরুণ পিতার প্রতি শ্রদ্ধা-ভালবাসা। একদিকে আদিম অজাচার ইচ্ছার জন্য মায়ের প্রতি আসক্তি, আবার সুপারইগোয় নিহিত টাবুর নিষেধে এ বিষয়ে অনীহা। ঈদিপাস্ কমপ্লেক্স [oedipus complex] নির্জ্ঞান মনের জন্মসূত্রে প্রাপ্ত স্বভাবধর্ম।

ফ্রয়েড মনে করেন, ব্যক্তি পূর্বপুরুষের মনোবৃত্তি নিয়ে জন্মায় ত' বটেই, তাছাড়া পূর্বপুরুষের ধ্যানধারণা, অভিজ্ঞতার স্মৃতি পর্যন্ত জন্মসূত্রে লাভ করে। তিনি বলেন—"Though we may admit that for the memory traces in our archaic inheritance we have so far no stronger proof than those ramnants of memory evoked by (psycho) analytic work, which call for a derivation from phylogenesis, yet this proof seems to me convincing enough to postulate such a state of affairs.

প্রাচীন পূর্বপুরুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, অভিজ্ঞতা, ধ্যানধারণা জন্মসূত্রে লাভ করে আজকের মানুষ—এই তত্ত্বের উপর ফ্রয়েডীয় মনসমীক্ষা ও মনস্তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। "If things are different, we are unable to advance are step further on our way, either in psycho analysis or mass psychology". [Freud] নির্জ্ঞান মনের রহস্য আবিষ্কারের ফ্রয়েডীয় পদ্ধতি যে বাঁধাধরা প্রতীকীবাদ [stereotyped symbolism] ও প্রতীকের অর্থ উদ্ঘাটনের উপর প্রতিষ্ঠিত—উপরোক্ত তত্ত্ব ছাড়া সে পদ্ধতি অচল। তাঁর নিজ্ঞানতত্ত্বকে এই "প্রাচীন উত্তরাধিকার" (archaic heritage) সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত না করতে পারলে এই সব তত্ত্বের সর্বজনীনতা দাবী করা চলে না। ঈদিপাস কমপ্লেক্স দেশ-কালের গণ্ডীতে বাঁধা পড়ুক—ফ্রয়েডের এ অভিপ্রায় ছিল না। ফ্রয়েডীয় মন শুধু সার্বজনীন নয়, সর্ব কালের। মনের আণ্ডারওয়ার্ল্ড (underworld) আবিষ্কার, নতুন এক শাস্ত্রের গোড়াপত্তন বলে দাবী করেন ফ্রয়েড।

সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানবমনের অসুবিধা বাড়ছে ফ্রয়েড মনে করেন। তার অবদমনের দায়িত্ব বেড়েই চলেছে। ইদের দৌরাত্ম্যের সঙ্গে যোগ হয়েছে বর্বর মানুষের "আর্কেইক হেরিটেজ"। কাজেই অবদমন আরও শক্ত ও জটিল হয়ে উঠেছে। এছাড়া যৌনতৃপ্তির ব্যাপারে বর্বর মানুষের (অজাচার নিষিদ্ধ হলেও), অনেকটা স্বাধীনতা ছিল। এক বিবাহের বালাই ছিল না—বিবাহ বন্ধনের খুব বেশী দায়িত্ব ছিল না। টাবু-নিষিদ্ধ যৌন-সম্ভোগের উপাচারও ছিল অজস্র। কাজেই সভ্যমানুষের মত যৌনশক্তি বা লিবিডোকে অ-যৌন কাজে অপচয় করতে হত না। ফ্রয়েডের ক্ষোভ, দুষ্ট সুপার ইগোর তাড়নায় এক বিবাহ বিধির প্রচলনের ফলে সুস্থ ও অবাধ যৌনতৃপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে আজ মানুষ। sublimate কথাটি ফ্রয়েডিয় শাস্ত্রে প্রচুর ব্যবহৃত। বাঙলা অর্থে কথাটির মানে, মহীয়ান বা উন্নীত করা। ফ্রয়েডীয় অর্থে—অতৃপ্ত যৌনবাসনাকে (libid) অযৌন ব্যাপারে নিয়োগ করতে বাধ্য হওয়াকে বলে sublimation। যৌনশক্তির উন্নীত করণ বা সাব্লিমেশন থেকেই নাকি যত কিছু সভ্যতা ও সংস্কৃতির সৃষ্টি। "Sublimation of instincts is an especially conspicuous feature of cultural evolution ; it is that makes it possible for higher mental operations, scientific, artistic, idealogical activites, to play such an important part in civilized life." (Freud)

সভ্যতার ফলে মানুষের, ব্যক্তি মানুষের কি ঘটছে (ফ্রয়েডীয় মতে) দেখাযাক। "The price of progress in civilisation is paid in forfeiting happiness"—এ উক্তি ফ্রয়েডের। আধুনিক সাহিত্যে এই উক্তিটি অনুরণিত হতে শুনি নানা ছন্দে। সভ্যতার দাম—আত্মসুখ বিসর্জন। ফ্রয়েড নানাভাবে আমাদের এ কথাটি বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। যতই সভ্য হচ্ছে মানুষ—ততই 'প্রাচীন উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আবেগ অভিলাষকে বিসর্জন দিতে হচ্ছে—অন্ততঃ দমন করতে হচ্ছে। অবাধ যৌনতৃপ্তির পথে সভ্যতা

ক্রমশঃ বেশী বাধা সৃষ্টি করে চলেছে। যৌনশক্তিকে (libido) আর উন্নীত করা (sublimate) যাচ্ছে না। ক্রমশ: জটিল ও কঠিন হয়ে উঠছে সমস্যা। মানুষের যৌনতৃপ্তিতে বাধা পড়ছে অবিরত আবার সাব্লিমেশনও পুরো হচ্ছে না, ফলে ঘটছে নিউরোসিস। "Thus civilisation & culture are viewed by Freud as leading inevitably to frustration, unhappiness & neurosis, inspite of the great accomplishment of modern times—(wells H. K.) ফ্রয়েডের মতে সভ্য সমাজের সকলেই অসুস্থ, সবাই নিউরোটিক।

যৌন প্রবৃত্তি ছাড়াও সভ্যমানুষ আর একধরনের প্রবৃত্তিকে অবদমন করতে বাধ্য হচ্ছে। এ প্রবৃত্তিও নাকি সেই আদিম পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে জন্মসূত্রে পাওয়া। এর নাম—ধ্বংসাত্বক প্রবৃত্তি (Death instinct)। প্রবৃত্তির তাড়নাতে মানুষ মানুষকে ঘৃণা করে, হিংসা করে, অথবা আক্রমণ করে ও সর্বাত্মক ধ্বংসের জন্য বিনা কারণে যুদ্ধ করে, অপরকে ধ্বংস করে—নিজে ধ্বংস হয়।

"The earlier mantal state may not have manifested itself for years, but none the less it is so for present that it may at any time again become the mode of expression of the forces in the mind, and that exclusively, as though all later development have been annulled, undone...The primitive stage can always be re-established. And so if we are to be judged by the wishes in our unconscious. We are like primitive men—simply a gang of murderers" (Freu) আইকম্যানদের ঘৃণা না করে করুণা করাই উচিত!

মানবমনের বিবর্তন সম্বন্ধে ফ্রয়েডীয় ধারণা মোটামুটি এই রকম। প্রবৃত্তি অবদমনের ফল প্রকৃতির নিষ্ঠুর প্রতিশোধ—এই হল ফ্রয়েডীয় ধারণার মূলকথা।

শিশুমনের বিকাশের ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা বর্বর মন থেকে সভ্যমনে উত্তরণেরই ইতিহাস। শিশুমন প্রাক্‌পিতৃ-হত্যাযুগের বর্বর মনের প্রায় অনুরূপ। শিশুর সুপার-ইগো সক্রিয় নয়। ইগো অপরিস্ফুট—। ইদ শুধু সক্রিয় ও অবদমনের পীড়ন মুক্ত। ইদ ইগো সুপার-ইগোর বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ বিভক্ত নয় শিশুমন। শিশুমন অখণ্ড। বর্বর মনের সঙ্গে শিশুমনের একটা বিশেষ প্রভেদ ফ্রয়েডীর অনুমানে দেখা যায়। জন্মমুহূর্তেই শিশুমন পূর্বপুরুষদের সমগ্র অভিজ্ঞতা স্মৃতি ধ্যানধারণা ইত্যাদির অধিকারী। ফ্রয়েড-বর্ণিত—নিজ্ঞান মন [The unconscious]· নিয়েই শিশু জন্মগ্রহণ করে। কী কী থাকে নির্জ্ঞান-মনের ভাণ্ডারে? কামাত্মক ও ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি সমুহ (Death Eros Instincts) তাদের অবদমন-অভিলাষ। অবদমিত ইচ্ছার পুনরাবির্ভাবের চেষ্টা। জাতির বিশেষ অভিজ্ঞতা তস্মৃতি, টাবু, নিষিদ্ধকরণের ফলে কামশক্তির বিকৃত প্রয়াস। শিশুমন থেকে বয়স্ক-মনে উন্নয়নের পথে প্রথমে আসে শৈশবকালীন যৌনসক্তি পর্ব। Infantile sexuality পর্ব সব শিশুকেই স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে, অতিক্রম করতে হয়। দ্বিতীয় পর্বে ইদিপাস সম্পর্কে স্থাপিত হয়—স্ত্রী ও পুরুষ শিশুর এই পর্বে বিভিন্ন ধরণের অভিজ্ঞতা ঘটে। তৃতীয় পর্বে লিঙ্গচ্ছেদের ভীতি (পুং শিশুর) ও লিঙ্গ-ঈর্ষা [স্ত্রী শিশুর]। চতুর্থ পর্ব মর্ষকাম ও ধর্ষকামেরচ্ছা জাগরণের পর্ব। ফ্রয়েডের মতে এই, চতুপর্ব অতিক্রান্ত হলে তবেই বয়স্থ-মন গড়ে ওঠে। এ-সম্বন্ধে ইংরাজী-বাংলা পুস্তক-পুস্তিকার প্রাচুর্য এত বেশী যে এ নিয়ে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। মানসিকতার বিকাশ সম্পর্কিত এই ফ্রয়েডীয় তত্ত্বকথা বৈজ্ঞানিক-মহলে সমাদৃত কোনদিনই হয়নি। কেননা তিনি মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত

অজ্ঞতাকে নির্জ্ঞান মনের পুরাতত্ত্বের তলায় চাপা দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর ইদ-ইগো স্থপারইগো তত্ত্ব অনুমানভিত্তিক হয়েই আছে—আধুনিক মস্তিষ্কবিজ্ঞানের বা অন্য কোনো বিজ্ঞানের অনুমোদন লাভ করে নি।

কিন্তু ফ্রয়েডীয় তত্ত্বকথা পেশাদার মনস্তাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক মহলের বাইরে বিশেষভাবে সমাদৃত। নাটক নভেল গল্প ইত্যাদি সাহিত্যের নানা বিভাগে, সিনেমা ও টেলিভিশনের পর্দায়, শিক্ষাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের দরবারে ফ্রয়েডের প্রভাব আজ অবধি অপরিসীম বলা চলে। জনসাধারণের মনেও নাটক, সিনেমা ও উপন্যাস থেকে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বকথা শিকড় মেলে বসেছে। তা না হলে আধুনিক মস্তিষ্ক ও মনোবিজ্ঞানের বিচারে ফ্রয়েড এতদিন অপাংক্তেয় হয়ে বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে যেতেন। তাঁর সূত্রগুলো পাঠ্য পুস্তকের পাতায় হয়ত কিছুটা স্থান অধিকার করত মাত্র।

ফ্রয়েডের জনপ্রিয়তার কারণ নিয়ে আলোচনা অন্যত্র করব। বর্তমানে এইটুকু বলা যথেষ্ট যে ভিক্টোরীয় যুগের অতি-শালীনতা ও কাপট্য গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে ফ্রয়েড তীব্র কশাঘাত করেছিলেন, ফলে তখনকার প্রগতিপন্থীরা ফ্রয়েডকে অকুণ্ঠিত অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। তাঁর তত্ত্বের সারবত্তা বা বৈজ্ঞানিক মূল্য বিচার করার প্রয়োজন তারা বোধ করেন নি। আর দ্বিতীয়তঃ—"The material Freud presented was peculiarly suited for dramatic exploitation—sex, murder, incest, perversion, a formula for character development & interpersonal relationship and a pervasive symbolism". ব্রডওয়ে ও হলিউডের এর থেকে বেশী কাম্য আর কি থাকতে পারে? নাট্যকার ও গল্প-লেখকের দল তাই অর্দ্ধশতাব্দী ধরে এই ফ্রয়েডীয়ান্ মেটিরিয়ালই নানা পাত্রে জনসাধারণকে পরিবেশন করে আসছেন!

ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব মস্তিষ্ক তথা দেহ-সম্পর্কিত নয়। দেকার্তের আমল থেকে দ্বয়বাদ দর্শনের যে-ধারা বয়ে এসেছে, ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব সেই ধারাকে পরিপুষ্ট করতে সাহায্য করেছে। নিও-ফ্রয়েডিয়ানরা দেহ-মন সমান্তরালবাদ তত্ত্ব প্রয়োগ করে নিউরোসিস-জনিত দৈহিক উপসর্গের অবাস্তব ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। বলা বাহুল্য ফ্রয়েডের কোন মূল বা তত্ত্ব—প্রয়োগশালায় পরীক্ষিত সত্য নয়। প্রাণীদেহের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ কোনো তথ্যই ফ্রয়েড মানব মনের ক্রমবিকাশের ব্যাখ্যায় গ্রহণ করেন নি।

এবার পাভলভের কথায় আসা যাক।

একই প্রজাতির বিভিন্ন প্রাণীর পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন পদ্ধতি ও নিম্নপ্রাণী থেকে উচ্চপ্রাণীতে উন্নয়ন পদ্ধতি—এরই প্রয়োগ প্রচেষ্টা পাভলভের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সুস্পষ্ট। কুকুর ও বানরজাতীয় প্রাণীর ব্যবহার ও অভিযোজন পদ্ধতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে তিনি মানবমস্তিষ্কের ক্রমবিবর্তন ও অভিযোজন সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্যের হদিশ দিয়েছেন। কণ্ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্সকে কেন্দ্র করে পাভলভের উচ্চমস্তিষ্ক-বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে। দেহ-মনকে পৃথক করে দেখা ও মানবমনকে দেহাতীত, স্থান কাল নিরপেক্ষ কল্পনা করার জন্য ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে নি। প্রকৃত বিজ্ঞান তথা বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের মূল-সূত্র অনুসারে বস্তুর ক্রমবিবর্তনের ফল ও উচ্চতম অভিব্যক্তির আধার মানবমস্তিষ্কে আরোপিত হয়েছে সেই বিশেষ ধর্ম বা গুণ, যাকে বলি মননধর্ম। মানব-মন পশু-মনের উচ্চতম পর্যায়। মানব-মস্তিষ্কে পশুদের অলভ্য ও অনায়ত্ত নতুন গুণের সমাবেশ ঘটায় মানব মনে ঘটেছে গুণগত জটিল পরিবর্তন।

মানবমনের ক্রমবিকাশের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে প্রথম প্রয়োজন মনুষ্যেতর প্রাণীর মস্তিষ্কের জ্ঞান।—এই হল পাভলভ প্রমুখ বিজ্ঞানীদের সুচিন্তিত অভিমত। মন মস্তিষ্কাশ্রিত, কাজেই মানবমস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের সম্যক ধারণা ব্যতিরেকে মন-সম্পর্কিত জ্ঞানলাভ অসম্ভব। নিম্নমস্তিষ্ক, মস্তিষ্কবল্কলের অধস্তন কেন্দ্রসমূহ [sub-cortical centres] ও মস্তিষ্ক-বল্কলের—অস্তিত্বের দিক থেকে মানবমস্তিষ্কের এ্যানাটমি বৈশিষ্ট্য দাবী করতে পারে না। কুকুর ও বানরদের মস্তিষ্কেও এই অংশগুলি—বিদ্যমান ও একই ভাবে বিন্যস্ত। শারীরবৃত্তের অর্থাৎ ক্রিয়াকলাপের দিক থেকে বিচার করলে উচ্চপ্রাণী ও মানব মস্তিষ্কের সমধর্মিতার নিদর্শন মিলবে—আনকণ্ডিশন্‌ড রিফ্লেক্স [সহজাত প্রবৃত্তি-মূলক রিফ্লেক্স] ও বাস্তব-নির্দেশক প্রথম সাংকেতিক স্তরের কণ্ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্স [পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য-রিফ্লেক্স]। এবার দেখা যাক পশু-মস্তিষ্কের সঙ্গে মানব-মস্তিষ্কের পার্থক্য কোথায় এবং কি ধরনের। মস্তিষ্ক-বল্কল [Cerebral Cortex] মানুষের ক্ষেত্রে বহুলাংশে বর্দ্ধিত, জটিল ও অনেকগুলো অংশ নব সংযোজিত। এই সংযোজনের মধ্যে আছে দ্বিতীয় সাংকেতিকতন্ত্রের নিয়ন্ত্রক অংশ—যা মানবমস্তিষ্কের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। পাঠ্য, শ্রাব্য ও কথ্য ভাষার মাধ্যমে মানুষের বাঙ্ময় জগতের সৃষ্টি ;—মানব-মস্তিষ্কের এই গুণগত নবগঠিত তন্ত্রের নাম দ্বিতীয় সাংকেতিকতন্ত্র। আনকণ্ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্স সিস্টেম ও প্রথম সাংকেতিক তন্ত্রাধীন কণ্ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্স সিস্টেম—পশুজগৎ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। আর বাক্‌শক্তি বা দ্বিতীয় সাংকেতিক তন্ত্রের উদ্ভব সমাজবদ্ধ যৌথজীবন ধারার সঙ্গে দশলক্ষ বছরের অক্লান্ত অভিযোজন প্রয়াসের ফলে। ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের ফলে মস্তিষ্কের অনুষঙ্গের (association) সংখ্যাধিক্যই শুধু ঘটল ভাবলে ভুল হবে। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের অনুষঙ্গ গঠনে সক্ষম হল মানবমস্তিষ্ক। মানবীয়-চিন্তা, বাচনিক চিন্তা, সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মস্তিষ্ক প্রক্রিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সংবেদনকে সামান্যীকরণ ও বিমূর্ত্তকরণের উপায়। পাভলভ দেখালেন মনের প্রাথমিক ধর্মচিন্তা উচ্চমস্তিষ্কের আনুষঙ্গিক অস্থায়ী রিফ্লেক্স-ক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। পশুমস্তিষ্কের অন্যান্য রিফ্লেক্স ক্রিয়ারই সমগোত্র অথচ সম্পূর্ণ নতুন ধর্মবিশিষ্ট এই রিফ্লেক্স। তার বৈশিষ্ট্য পূর্বোল্লিখিত সামান্যীকরণ ও বিমূর্ত্তকরণ ধর্ম। যার ফল একটি শব্দার্থবাচক উদ্দীপককে কেন্দ্র করে হাজার হাজার রিফ্লেক্স ক্রিয়া গঠনের সম্ভাবনা ; অভিযোজনক্ষমতার বিপুল প্রাচুর্য ও অপার সম্ভাবনা। বহির্বাস্তবের সঙ্গে অতিসূক্ষ্ম সম্পর্ক-স্থাপন, সেই সম্পর্কের সংরক্ষণ ও ক্রমোন্নয়ন সম্ভব হল।

মন একটা substance নয়, বস্তুবাদী মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞাতেও নয়। মন মস্তিষ্কের একটি বিশেষ পর্যায়ের স্বাভাবিক ক্রিয়া বা ধর্ম, আধুনিক মনোবিজ্ঞান মনের বিশেষ সংজ্ঞাদানে সক্ষম। “Mind is the functioning of the highest parts of the brain in the life long process of adaptation to the conditions of life” একজন বস্তুবাদী দার্শনিকের কথা তুলে দিলাম। পশুমন থেকে মানবমনের বৈশিষ্ট্য তার বিশেষ ধরনের চিন্তাকরার ক্ষমতায়, তার বাক্-শক্তির বিকাশে। শ্রমক্ষমতা ও বাক্‌শক্তি-এ দুয়ে মিলে মানুষকে প্রকৃতির উচ্চতমশীর্ষে স্থাপিত করেছে। পশু শুধু নিজেকে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করে, প্রকৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষ তার থেকে অনেক বেশী করে ; সে প্রকৃতিকেই পরিবর্তিত করে নিজের প্রয়োজনমাফিক। মন—বস্তুর জটিলতম বিন্যাস মস্তিষ্কেরই স্বাভাবিক বৃত্তি। পাভলভ বলেছেন—“If all our relations with the surrounding world, even the most dalicate ones are but our physiological brain, then there is no room for any other interpretation of the world “mind”. And this is the kernel of the contradiction”.

প্রচলিত ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে পাভলভীয় প্রতিবাদ এক উল্লেখ্য ঘটনা। ভাববাদের বিরুদ্ধে বস্তুবাদের লড়াই নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে পাভলভের গবেষণালব্ধ তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে। মানবমন, ক্রমশঃ বিষয়গত গবেষণার আয়ত্তাধীন হতে চলেছে। মননক্রিয়া মস্তিষ্ক-ক্রিয়াসঞ্জাত—এ সিদ্ধান্তানুযায়ী মানবমন নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা এখন সম্ভব। পাভলভীয় শারীরবৃত্তমূলক পদ্ধতিতে মন নিয়ে অনেক কিছু প্রাকৃতবিজ্ঞানানুগ গবেষণা এযাবত হয়েছে। তবে যা হয়েছে তা মাত্র সূত্রপাত। কণ্ডিশন্ড্ রিফ্লেক্স পদ্ধতি মন-সম্পর্কিত নতুন তথ্য আহরণের প্রচুর সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। আজ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অতিজটিল মননক্রিয়া পর্যন্ত বোঝবার ও জানবার সুযোগ এসেছে। এবার পাভলভ ও তাঁর পরবর্তী গবেষকদের আহৃত তথ্য শিশুমনের ক্রমবিকাশের ব্যাখ্যায় কি ধরনের নতুন আলোকপাত করেছে, দেখা যাক্।

এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পাভলভ বলেছিলেন, এযাবত মনস্তত্ত্ব প্রারম্ভিক বিবরণমূলক ও শ্রেণীবিভাজনমূলক কাজে ব্যাপৃত ছিল। পর্যবেক্ষণের সাহায্যে সংবেদন, অনুভূতি, স্মৃতি, ধ্যান, ধারণা, ইত্যাদি মানসিক ধর্মের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় ও শ্রেণীবিন্যাসের পরবর্তী অধ্যায় এখন শুরু হওয়া দরকার। বিভিন্ন মননক্রিয়ার কার্যকারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালানো [অবশ্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অন্তদর্শন প্রণালী ছিল এযাবত মনস্তাত্ত্বিকদের একমাত্র গবেষণাপদ্ধতি ; বলা বাহুল্য এ পদ্ধতিকে কোনমতেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলা চলে না] এখন মনস্তাত্ত্বিকদের অবশ্যকর্তব্য। তবেই প্রকৃতিবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সমপর্যায়ে উন্নীত হতে পারবে মনস্তত্ত্ব। তাঁর নির্দেশিত পথে "শিশুমনের ক্রমবিকাশ" সম্পর্কে প্রচুর পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে। মনস্তত্ত্বের এই বিশেষ জটিল সমস্যাটির [পাভলভীয়দের ধন্যবাদ !] সমাধান আসন্ন।

মানবশিশু কতকগুলো আনকণ্ডিশন্ড রিফ্লেক্স (যথা চোষা, গেলা, মলমূত্রাদি ত্যাগ প্রাথমিক আত্মরক্ষামূলকই) নিয়ে জন্মায়। কিন্তু প্রথম থেকেই সংবেদন (Sensation) ছাড়া এই রিফ্লেক্সক্রিয়াগুলি ঘটতে পারে না। ঠোঁটে কোনো কিছু ছোঁয়ালে তবেই চোষার চেষ্টা করবে শিশু, মুখে কোনো কিছু লাগলে তবেই গেলার প্রশ্ন আসবে। সংবেদন ছাড়া আনকণ্ডিশন্ড রিফ্লেক্স—জন্মদত্ত ক্ষমতাগুলোও কার্যকরী হতে পারে না। Sensation—সংবেদন কি ? পাভলভ বললেন—সংবেদন হচ্ছে বোধ বা জ্ঞানার্জনের প্রথম ধাপ। সংবেদন—analyser বা ইন্দ্রিয়ের বিশ্লেষণ ধর্মী ক্ষমতা।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

**গত সংখ্যায় আমরা মানসিক ক্রমবিকাশের আলোচনায় মনস্তাত্ত্বিক পণ্ডিতদের আহ্বান জানিয়েছি। 'মনোবিদ্'কে ধন্যবাদ যে তিনি আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। স্থানের স্বল্পতা হেতু লেখাটি এক সংখ্যায় ছাপা গেল না। অন্যান্য মনস্তাত্ত্বিক লেখকদের এ আলোচনায় যোগদানের আহ্বান জানাচ্ছি। —সম্পাদক।

মাধ্যমিক শিক্ষায় আমেরিকা, ভারত ও সোভিয়েত

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন সেনগুপ্ত।

মোটামুটি ভাবে এটা বলা যেতে পারে যে ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত শিক্ষায় ও বিজ্ঞানে আমেরিকা সোভিয়েত থেকে অনেক বেশী অগ্রসর ছিল। বাস্তবিক পক্ষে ১৯৫৭ সাল পর্য্যন্ত আমেরিকানরা কল্পনাই করতে পারে নি যে অন্য কোনো জাতি এই সব বিষয়ে তাদের চাইতে অগ্রসর হবার ক্ষমতা রাখে। এইরূপ বাস্তব ও মানসিক অবস্থা থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল American Century দৃষ্টিভঙ্গী। প্রায় সকল আমেরিকানই, তিনি উদারনৈতিকই হন, প্রতিক্রিয়াশীলই হন শ্রমিক, নেতা, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক-অধ্যাপক, রাজনৈতিক নেতা, লেখক, ভাড়াটিয়া সাংবাদিক, সামরিক অফিসার, ব্যবসায়ী, কোটিপতি, সকলেই বিশ্বাস করতেন যে, এক সময় যেমন গ্রিসীয় যুগ ছিল, রোমীয় যুগ ছিল, উনবিংশ শতাব্দী যেমন ব্রিটিশ যুগ ছিল, তেমনই বিংশ শতাব্দী হচ্ছে আমেরিকান যুগ। এদের পক্ষ থেকে আমেরিকার সুবিখ্যাত "Life" ও "Time" পত্রিকার মালিক Henry Luce তাঁর American Century (১৯৪১) নামক বইতে ঘোষণা করলেন যে "This Twentieth Century is the American Century," "the world leadership is ours"। ঢাক ঢোল পিটিয়ে Luce আমেরিকানদের আহ্বান করলেন: "to accept wholeheartedly our duty and our opportunity as the most powerful and vital nation in the world and in consequence to exert upon the world the full impact of our influence, for such purposes **as we see fit and by such means as we see fit**....America is already the intellectual, scientific and artistic capital of the world ; (our ships and airoplanes will go) **Where we wish, when we wish and as we wish.**"[১]

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট খানিকটা অন্যপথে যাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর কয়েকদিন পরেই আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রী James Byrnes তাঁর সরকারের আগামীকালের নীতি ঘোষণা করে বললেন (July 1945) : "What we must do now is not to make the world safe for democracy but make the world safe for the united States." একমাস যেতে না যেতেই আগস্ট মাসে হিরোশিমা ও নাগাসাকীতে এটম বোমা ফাটিল। মিত্র শক্তিদের অজান্তেই আমেরিকা নিজের দায়িত্বে এই এটম বোমা ফাটিয়েছিল, এই কথাটাই প্রমাণ করতে যে, এই ভয়ঙ্কর পৈশাচিক মারণ-অস্ত্র কেবল মাত্র আমেরিকারই একচেটিয়া এবং যার জোরে, Byrnes এর কথায়, যুদ্ধের পর আমেরিকানরা সক্ষম হবে, "to dictate our own terms at the end of the war."

তারপর থেকে নির্লজ্জ ভাবে চলতে শুরু করল দুনিয়া ব্যাপি আমেরিকার উদ্ধত্য পূর্ণ "ঠাণ্ডা যুদ্ধ"। টেকনোলজী, অর্থ ও অস্ত্র শক্তি এবং সর্বশেষে এটম বোমার বলেই ইয়াঙ্কিদের American Century মনোভাব

---

(১) Luce Henry R.—The America Century, New york, 1941, pp 23, 27, 31, 36.

এবং তারা ধরেই নিয়েছিল যে বহু বৎসর পর্যন্ত আর কেউ এটম বোমা তৈরী করতে পারবে না। কিন্তু ৫/৭ বৎসর যেতে না যেতেই সোভিয়েত এটম বোমা তৈরী করল। কোরীয়ার রণাঙ্গনে দেখা গেল সোভিয়েতের MIG জঙ্গী এরোপ্লেন আমেরিকান প্লেনের চাইতে উৎকৃষ্টতর। তারপর রকেট বিজ্ঞানেও দেখা গেল সোভিয়েত দ্রুত এগিয়ে চলেছে। কিন্তু এতেও আমেরিকার চৈতন্য হল না।

বহুদিন ধরে আমেরিকানরা মহা আড়ম্বরের সঙ্গে ঘোষণা করছিল যে তারাই সর্ব প্রথম মহাকাশে রকেট প্রেরন করবে। তাদের চেষ্টারও কোন ত্রুটি হয় নি। কিন্তু ১৯৫৭ সালে ৪ঠা অক্টোবরে বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত সংবাদ পৌঁছল যে সোভিয়েতই প্রথম মহাকাশে স্পুটনিক পাঠাতে সক্ষম হয়েছে। জাতীয় জীবনে এত বড় আকস্মিক আঘাত আমেরিকানরা আর কোনো দিন পায় নি। পার্ল হারবারের আঘাতও স্পুটনিকের আঘাতের নিকট তুচ্ছ। পার্ল হারবারের ক্ষেত্রে তাঁরা তাদের "সম্মান" ও শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবার সুযোগ পেয়েছিল, কারণ তা ছিল সামরিক শক্তির ব্যাপার কিন্তু এই ক্ষেত্রে তার হারানো গৌরবের পুনরুদ্ধারের আর কোনো সম্ভাবনাই সে দেখতে পেল না; যেহেতু এক্ষেত্রে হল মস্তিষ্কের শক্তির প্রশ্ন, সেখানে তার দৌর্বল্যের কথাটাই তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। intellectual leadership"-এর গর্বে সে এতদিন অন্ধ হয়েছিল, আজ সে মর্মাহত হয়ে দেখল তা রাতারাতি তার হাত থেকে ফস্‌কে গিয়েছে। আমেরিকানরা অবাক হয়ে আবিষ্কার করল তারা সোভিয়েতের নিকট হেরে গিয়েছে, সোভিয়েতের এটম বোমার নিকট নয়, সোভিয়েত বিজ্ঞান ও শিক্ষার নিকট; তারা ভেবেছিল যে সোভিয়েতের সঙ্গে তাদের প্রতিযোগিতাটা ছিল শুধু মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতা—এখন তারা কিছুটা বুঝতে পারল যে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে প্রতিযোগিতাটা মূলত হচ্ছে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও শিক্ষার প্রতিযোগিতা, যে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় তারা দ্রুত হেরে যাচ্ছে। এবং "Where we wish, when we wish and as we wish"-এর যুগ চিরতরে অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে।

ঠিক এই কথাটাই জনৈক আমেরিকান ডিপ্লোম্যাট একজন সোভিয়েত ডিপ্লোম্যাটকে বলেছিলেন যে "You have defeated us in your class-rooms." আমেরিকার চিন্তাশীল ব্যক্তিদের নিকট সোভিয়েত স্পুটনিক সোভিয়েত বিজ্ঞান ও শিক্ষার প্রতিকরূপে দেখা দিল। নিজেদের ও সোভিয়েতের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি তাদের প্রচণ্ড আগ্রহ জেগে উঠল, যে আগ্রহ পূর্বে তাদের বিশেষ কিছু ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ও প্রফেসার, স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষা বিভাগের বড় বড় কর্মচারী, ব্যবসায়ী, বিজ্ঞানী, লেখক, রাজনৈতিক নেতা—সকলেই ছুটলেন দলে দলে সোভিয়েত শিক্ষা-ব্যবস্থা নিজের চোখে পরীক্ষা করবার জন্য। আশ্চর্য্য হয়ে তাঁরা দেখলেন যে সোভিয়েত শিক্ষা প্রতিটি স্তরে, কিণ্ডারগার্টেন থেকে ইউনিভার্সিটি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা পর্য্যন্ত শিক্ষার্থীদের শ্রেষ্ঠতর শিক্ষা দিচ্ছে, অনেক বেশী সংখ্যক টেকনিশিয়ান, ইঞ্জিনিয়র, বৈজ্ঞানিকের সৃষ্টি করছে; তাঁরা আরও দেখলেন সোভিয়েতের ছাত্রছাত্রীরা আমেরিকানদের চাইতে অনেক বেশী পরিশ্রমী, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং শ্রেষ্ঠতর ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষকদের নিকট থেকে শিক্ষা পাচ্ছে, এবং সোভিয়েতের শিক্ষকরাও আমেরিকার শিক্ষকদের তুলনায় অনেক বেশী শিক্ষিত, দেশে তাঁরা সম্মানিত ও সমাজে তাঁদের স্থান সর্বোচ্চে এবং তাঁদের বেতনের হারও খুবই উচ্চ। দেশে ফিরে যেয়ে তাঁরা সোভিয়েতের সঙ্গে তুলনা করে নিজেদের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে তুমুল আলোচনা শুরু করলেন; প্রচুর গবেষণা হল, প্রবন্ধ, পুস্তক, রিপোর্ট ছাপা হল, অনেক বক্তৃতা হল। যে আমেরিকার লোক শিক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন

ছিল, তারা আগ্রহ সহকারে শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা করতে লাগল। স্পুটনিকের পূর্বে যে-সব কথা বললে বা লিখলে তাদের un-American বলে ম্যাকার্থীর নিকট অভিযুক্ত হতে হত, আজ তারা সেই সব তীব্র সমালোচনামূলক কথা মুক্তকণ্ঠে বলতে লাগল।

তারা সোভিয়েতের সঙ্গে তুলনা করে দেখতে পেল যে যখন ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় শতকরা ২০ জনেরও কম লোক লেখা পড়া জানত ও উচ্চ শিক্ষার জন্য মাত্র ৯১টি প্রতিষ্ঠান ছিল ও তাতে ছাত্র সংখ্যা ছিল মাত্র ৬০,০০০, সেই সময় আমেরিকায় ছিল ৫০০টি উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ও তাদের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ, অর্থাৎ রাশিয়ার দশগুণ বেশী। মাত্র ৪০ বৎসর পূর্বেও তাদের দেশ ছিল শিক্ষায় রাশিয়া হতে ১০ গুণ বেশী অগ্রসর। কিন্তু আজ সে দেশে নিরক্ষরতা তো দূর হয়েছেই. সাধারণ শিক্ষা তো বাধ্যতামূলক হয়েছেই, উপরন্তু ৭৬৭টি উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করছে ২০ লক্ষ ছাত্রছাত্রী, ও সেখানে বৈজ্ঞানিক গবেষকদের সংখ্যা ২ লক্ষ ৪০ হাজার, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন ৯৫,০০০ বিজ্ঞানের ডক্টর ও কাণ্ডিডাট। আমেরিকায় এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা অনেক কম। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, জারের আমলে এশিয়ার যে সব উপনিবেশগুলিতে উচ্চ শিক্ষা তো দূরের কথা, শতকরা ৩ জন কি ৪ জনেরও বর্ণপরিচয় ছিল কিনা সন্দেহ. সেখানেও নিরক্ষরতা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়ে বহু উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। যেমন উজবেকিস্থানে উচ্চ শিক্ষার ছাত্র সংখ্য ২৪,০০০ (ও গবেষকের সংখ্যা ১,৬০০) কাজাকস্থানে ১৬,০০০ (১,২০০), আজারবৈজান ১৭,৪০০ (২,৪০০), জর্জিয়া ২২,৯০০ (৫,৩০০), কিরগিজিয়া ৫,২০০ (৩০০), তাজিকিস্থান ৫,৮০০ (৪০০), আরমেনিয়া ২২,১০০ (৫,১০০) তুর্কমেনিয়া ৫,৩০০ (৩০০) এবং এই সব প্রত্যেক দেশেই একটি করে Academy of Sciences রয়েছে।

যাই হোক, আমেরিকার শিক্ষা সম্বন্ধে এই ব্যাপক আলোচনা থেকে যে-কথাটি প্রায় সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য হলেন তা হচ্ছে যে আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষা—যা গত ৫০।৬০ বৎসর ধরে চলে আসছে—তা ব্যর্থ হোয়েছে।[১] উপরন্তু আমেরিকার শিক্ষা-সংকট আজ চতুর্দিক থেকে এতই সমস্যা জর্জরিত (নিম্নমানের শিক্ষা, মৌলিক বিষয়বস্তুগুলির শিক্ষার অভাব, শিক্ষকদের স্বল্প বেতন এবং সমাজে তাঁদের সম্মানের অভাব, শিক্ষার উদ্দেশ্য ও শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে সকলের মধ্যে তীব্র মতভেদ, স্কুলের ও ক্লাস-ঘরের অভাব, শিক্ষা-সুযোগের অসমতা, নিগ্রোদের প্রতি জাতিবিদ্বেষ ও তাদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা, সেগ্রিগেশন, শিক্ষা-দর্শনের অভাব, ছাত্রছাত্রীদের নৈতিক অবনতি, উচ্ছৃঙ্খলা এবং তাদের অপরাধের সংখ্যা (child delinquency) প্রতি বৎসর বৃদ্ধিপ্রাপ্তি,[২] ইত্যাদি ইত্যাদি), যে তাঁরা তার সমাধানের জন্য বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে কোন পথই খুঁজে পাচ্ছেন না।[৩]

---

(১) "মানব মন"-এর এপ্রিল, ১৯৬২র সংখ্যায় বর্তমান লেখকের 'আমেরিকার স্কুল শিক্ষায় প্রয়োগবাদের ফলাফল" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(২) আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থায় ও তার সমগ্র সামাজিক ব্যবস্থায় আজ যে চরম সংকট দেখা দিয়েছে তারই একটা দিক হল ক্রমবর্দ্ধমান Child Delinquencyর সমস্যা। এই সমস্যা আমেরিকায় ও পশ্চিমী জগতে এমন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে এবং যে-সমস্যা ভারতেও দেখা দিতে শুরু করেছে, যে সে-সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ 'মানব মন'-এর একটি পরবর্তী সংখ্যায় আলোচনা করা হবে।

(৩) Saturday Review পত্রিকায় (১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬০) এক আলোচনায় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Woodring বলেছেন : "What is the cure of the educational malaise (in the U. S. A) ? It lies, I believe,

এই সব আলোচনার ফলে আর একটা যে বিষয় ফুটে উঠেছে তা হচ্ছে যে, পূর্বে যেখানে তাদের শিক্ষায়, সমাজ ব্যবস্থায় ও ভবিষ্যতের প্রতি যে আত্মবিশ্বাস ছিল আজ তার পরিবর্তে তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে একটা গভীর নৈরাশ্য ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা। এবং সেই কথাটাই প্রকাশ করেছেন কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক George Beredy : "This basic pride is now, alas, beginning to yield to anguished insecurity. ……he growth of education and culture in the U S has been truly spectacular. Yet when faced with criticisms a relatively few dare to proclaim their belief in its continuing splendid prospects." (**Public Education in America,** pp, VII-VIII)। আর একজন অধ্যাপক, Alexander Stoddard বলেন : "The direction and the place of the American high school in our country's destiny are uncertain as we look toward a highly precarious future." (**High school in a New Era,** p, 80)।

Deweyপ্রবর্তিত প্রয়োগবাদী শিক্ষানীতি চালু হওয়ার ফলে আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষা যে কতখানি অবনতির পথে গিয়েছে সে সম্বন্ধে কয়েকটি প্রতিনিধিত্বমূলক মতামত থেকেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। আমেরিকার পেনসিলভ্যানিয়া রাজ্যের গভর্নর George M. Le$_{a}$der ২৮শে জানুয়ারী ১৯৫৮তে গভর্নরদের কনফারেন্স উদ্বোধন করতে যেয়ে বলেছিলেন : "I was equally surprised to learn that the State requirements for a high school diploma are shockingly few. Only five basic units in the last three years of high school are required for graduation : two units in English, two units of social studies, and one unit of physical educacation. The rest of the subjects for which graduation credit is given can be selected by the student. All too many students choose their subjects as casually as they would choose their lunches in the school cafeteria. As a result, too many of our school graduates have studied no geometry or trigonometry, no physical sciences, no foreign languages." (১)

---

in the massive does of new ideas and the realizatian by parents, teachers, school boards, and administrators that many of the old ways are inadequate, outdated and stultifying.". আর একজন শিক্ষার অধ্যাপক, Dr. L loyd Trump এর মতে "Major improvements in the quality of education can only be accomplished by making basic changes in present practices. ……Only limited gains can be realized fom the fragmented attempts at improvement. The whole concept of the secondary school—its facilities its purposes, methods, its staffs, its curriculum, its finances—must undergo basic, carefully considered changes." (ঐ)

(১) আর একজন আমেরিকান লিখেছেন : "Only about 10% of all American high schools have any physics courses ; only about 14% have any chemistry. An American authority told me that the soviet child graduating from the 10th grade (equivalent to our 12th), aged about seventeen, has a better scientific education than most American *college* graduates. In particular soviet students are far ahead in mathematics. For instance, the average Russian boy or girl, takinig the normal course, get more than *five times* the amount of science and mathcmatics that is stipulated for entrance even into such a specialized American institution as the Massachusets Institute of Technology." (Homer Bigart in *New York Time*, II Nov., 1957)।

আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিকাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপক Arnold Rogow লিখেছেন : "One of the trends at the secondary school level (in America) can be described as a trend toward the provision of the least education for the least educated, by the least educated. ...The prevailing stress in secondary education appears to be on adjustment to contemporary social norms and attitudes, on 'getting:along' with school-mates parents & comunity." (Nation, 26th. Jan' 1957)

Kieth Glennan (President, chase Instituite of Technology, and Administrator, National Aeronautics and space Administration, Washington) ১৯৫৮ সালে সোভিয়েত ঘুরে এসে American Association for the Advancement of science-এর এক সভায় (২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৫৯) সোভিয়েত শিক্ষার সঙ্গে তুলনা করে দেখালেন যে সে দেশে যখন বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারীং-এ ছাত্র সংখ্যা বছর বছর বেড়ে যাচ্ছে তখন "Why is the enrollment in engineering curricula continuing to decline in U S, when engineering opportunities were at its height? Freshman enrollment in engineering decreased 13% in 1958 as compared with 1957. Again in 1959 a further decline of 4% was recorded. সোভিয়েত ছাত্রদের সম্বন্ধে গ্লেনানকে যা সব থেকে মুগ্ধ করেছিল—এবং যা তিনি আমেরিকার ছাত্রদের মধ্যে দেখতে পান না তা হল "(it) was the tremendous enthusiasm for and dedication to education which permeats their whole society. Russian students do not by-pass tough courses. There was no evident concern over too many hours of study. There was a fierce concentration of energy on the task at hand. It is in terms of dedication and motivation that the soviets are outstripping us...It is now apparent that the nation whose citizens are willing to work to develop their own capabilities to the utmost through education is the nation which will win and maintain leadership in the world of tomorrow (**Vital Speeches,** I feb, 1960)

সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় এই যে-যে Life পত্রিকার মালিক **American Century** লিখেছিলেন, সেই Life পত্রিকারই অন্যতম সম্পাদক Sloan Wilson লিখেছিলেন : (Life 12 May, 1958) "In Russia children have more reason to study. In the soviet union scientists and technicians were the new aristocrats (?) and the only way to join their ranks was through academic accomplishment....The American youngster who miraculously does arrive in school with an honest drive to learn finds himself having to play the role of 'queer duck'—a difficult role indeed for most adolescents. Most of the public schools are simply not geared for him....he must contend with hordes of youngsters drifting through school in search of easy roads to high pay and with bland disregard of intellecutual values which has affected many school administrators and teachers, along with most other Americans.

"Upon arriving at secondary school today an American youngster is faced with a bewildering choice of literally scores of subjects many combinations of which can lead to a diploma, and many of which are far easier than physics, mathematics or a foreign language. He can study marriage, chorus or 'advertising arts.' Courses in typewriting and dancing vie for his time.

"The upshot is that many a brilliant youngster finds that the school has assumed the aspects of a carnival....It is hard to deny that American schools, which were supposed to reflect one of histroy's noblest dreams and to cultivate the nation's youthful minds, have degenerated into a system of coddling and entertaining the mediocre."

Wilson তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহারে বললেন যে আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে আজ আমেরিকার এই দুরবস্থা হয়েছে যে সেখানে ছাত্রদের মধ্যে (১৯৫৬ সালে) শতকরা মাত্র ৩৪ জন ফিজিক্স, ৩৭ জন অঙ্ক, ৫ জন বিদেশী ভাষা শেখে এবং এই সংখ্যাও দিনের পর দিন কমে যাচ্ছে। বিখ্যাত শিক্ষাবিদ Stiphen Leacock আমেরিকার এই শিক্ষাকে যখন বলেছিলেন যে এটা হচ্ছে "10 per cent substance and 90 per cent mixed wind and humbug," তখন তিনি কিছু মাত্র অত্যুক্তি করেন নি।

স্বভাবতই স্কুল শিক্ষার এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিক্রিয়া যে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও আঘাত করবে তাতে আর আশ্চর্য কি? তাই আমেরিকায় আজ যে পরিমাণ বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তারের প্রয়োজন তার অনেক কম তৈরী হচ্ছে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিতে ও তাদের বহু সংখ্যক ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী আমদানী করতে হচ্ছে বিদেশ থেকে। শুধু আমেরিকাতেই নয়, সমগ্র ধনতান্ত্রিক জগতেই তার সর্বব্যাপী সামূহিক সংকটের একটা অংশরূপে এই শিক্ষা সংকট দিনের পর দিন গভীরতর হয়ে উঠছে।

ভারতের শিক্ষা সমস্যাও বহুদিনকার একটা প্রধান সমস্যা। ইংরেজ শাসনে ভারতে যে কয়টি লোক স্কুল কলেজে শিক্ষা পেত প্রথমত তাদের সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়, আর দ্বিতীয়ত সেই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজের শাসনযন্ত্র ও তাদের সওদাগরী আফিসগুলি চালনা করবার জন্য একদল কেরানীকুলের সৃষ্টি করা। এই নোট-বই মুখস্ত-করা কেরানীগিরি শিক্ষার সঙ্গে না ছিল ভারতীয় জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে বিশেষ কোনো যোগাযোগ,না ছিল তাতে বর্তমান কালের জীবন সংগ্রামে সম্মুখীন হওয়ার মনুষ্যোচিত বিশেষ কোনো উপকরণ। এই শিক্ষায় শিক্ষিতদের শরীরটা যেমন অপুষ্ট থেকে যেত, মানসিক পাকযন্ত্রটাও তেমনি অপরিণত থেকে যেত। এই শিক্ষাযন্ত্র থেকে আর এক শ্রেণীর জীব যারা বেরিয়ে আসত তারা ছিল বিজাতীয় মনোভাবাপন্ন আত্মমর্যাদা জ্ঞানবিহীন ইংগ-বংগ সমাজ।

তাই বহুকাল থেকে বর্তমান যুগোপযোগী জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের আন্দোলনও ভারতীয় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গেই গড়ে উঠেছে। রামমোহন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে রানাডে, গোখলে, বিবেকানন্দ, গান্ধী, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডাঃ মেঘনাদ সাহা ও সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ—সকলেই তাঁদের চিন্তায় ও কর্মে জাতীয় শিক্ষাকে যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসও ভারতীয় শিক্ষা-সমস্যা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিল। এই কংগ্রেসের নেতৃত্বে ও গান্ধীর উপস্থিতিতে ১৯৩৯ সালে ওয়ার্ধায় ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে যে জাতীয় শিক্ষা সম্মেলন

হয়েছিল তাতে যে দু'টি মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল তা হচ্ছে শিক্ষাকে জাতীয় করতে হবে এবং তাকে জীবনমুখী করতে হবে। তাই সকলেই আশা করেছিলেন যে স্বাধীনতা লাভের পরই ভারতে বর্তমান সময়োপযোগী জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তন হবে।

স্বাধীন ভারতে দুইটি কমিশন বসল—একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ডাঃ রাধাকৃষ্ণানের সভাপতিত্বে, অন্যটা মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ডাঃ মুদালিয়রের সভাপতিত্বে। ১৯৫৩ সালে মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্ট বেরোল। ১৯৫৬ সালে ভারত সরকার আবার একটা Indian study Team নিযুক্ত করলেন। এই টিম মাধ্যমিক শিক্ষা বিধি বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করার জন্য অনেকদিন ধরে আমেরিকা ও ইংলণ্ড ঘুড়ে বেড়াল। তার পর ১৯৫৭ সাল থেকে নতুন মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে চালু হলো।

এই নতুন মাধ্যমিক শিক্ষার উপরই যে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ দেশের ভবিষ্যৎ অনেক পরিমাণে নির্ভরশীল, তা বলাই বাহুল্য। তাই এই মাধ্যমিক শিক্ষাবিধি ও তার পাঠক্রমের চরিত্র কি, এবং বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের পক্ষে তা উপযোগী হয়েছে কিনা—এই সব প্রশ্ন বিশেষভাবে ও বহুল পরিমাণে আলোচনা করা প্রয়োজন।

এই মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রম সম্বন্ধে যে-বিষয়টি সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হচ্ছে এই যে, এই পাঠক্রমকে কৃত্রিমভাবে ও অবৈজ্ঞানিকভাবে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে। কয়েকটি পাঠ্যবিষয়কে core subjects (সর্বজন গ্রহনীয় বিষয়), এবং অন্য কয়েকটি বিষয়কে elective subjects (ঐচ্ছিক বিষয়) নাম দেওয়া হয়েছে। উপরন্তু elective subjects-কেও আবার ৭ ভাগে ভাগ করা হয়েছে—Humanities, Science, Technical, Commerce, Agriculture, Fine Arts, Home Science। এই পাঠক্রম যাঁরা প্রস্তুত করেছেন তাঁরা যে অত্যধিকভাবে আমেরিকার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এমন কথাও বলা চলে যে এই পাঠক্রমের সবটাই আগাগোড়া আমেরিকার নকল। মূল নীতিগুলি ছাড়াও core subject, elective subjects, social studies, Home science—এই সব নামগুলি পর্য্যন্ত আমেরিকার পচা গলা, দুর্গন্ধযুক্ত পাঠক্রম থেকে ধার করা।

প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে core subjects বলতে কি বোঝায়, তার সংজ্ঞা কি? যে-দেশ থেকে এত আড়ম্বর-সহকারে আমাদের দেশী পণ্ডিতরা এই নামগুলি ধার করে এনেছেন, সেই আমেরিকাতেই core subjects সম্বন্ধে কারো কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। প্রত্যেকটি স্কুল. প্রত্যেকটি শিক্ষক core subjects-এর ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। অনেক আমেরিকান শিক্ষকের মতে core subjects-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের মধ্যে ছাত্রদের মধ্যে Social solidarity, Social integration স্থাপন করা। কিন্তু সমগ্র স্কুলশিক্ষার উদ্দেশ্যও তো তাই, তা হলে আবার core subjects-এর প্রয়োজনীয়তা কি? একজন আমেরিকান শিক্ষক তাঁর একখানা মোটা বইতে লিখেছেন: "This core would be centered around a certain area or areas of study, such as the social studies, for example, and would be required of all pupils in order to give them further light upon the common problems of citizenship in this country. Another purpose of the core curriculum would be to develop school programs in terms of social and individual needs and interests of pupils." (Minor Gwynn: Curriculum Principles and Social Trends, N. y., 1950, p. 165)। স্কুলপাঠ্যের পরিপ্রেক্ষিতে

এইরূপ বাক্যবাগীশতার কোনো অর্থ হয় কি? এই কারণেই তো অধ্যাপক Leacock বলেছিলেন যে. আমেরিকার শিক্ষার ৯০ ভাগ হচ্ছে "mixed wind and humbug."

ভারতীয় মাধ্যমিকশিক্ষার পাঠক্রমে core subjet-এর অধীনে রাখা হয়েছে তিনটি ভাষা, Social Studies, General Science, Elementary mathematics এবং Crafts। আমেরিকা থেকে ধার করা এই social studiesবস্তুটি ঠিক কি? এতে যে-বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তাতে একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তিরও মাথা ঘুরে যাবে। ইতিহাস, অর্থনীতি, ভূগোল, নৃতত্ব, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়গুলির শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে আমেরিকান কায়দায় এখান থেকে খানিকটা ওখান থেকে কিছুটা নিয়ে integration করার নাম করে একটা অদ্ভুতধরনের খিচুড়ী বানান হয়েছে[১]। General Science নামে যে আর একটি core subject যোগ করা হয়েছে তাও physics, chemistry, zoology, biology ইত্যাদির একটা খিচুড়ী। Crafts-এ শিখতে হবে চরকা কাটা, তাঁত বোনা, ছুতার, মিস্ত্রী, দর্জীর কাজ—যার সঙ্গে না আছে বিজ্ঞানের সম্বন্ধ, না আছে কলা-শিল্পের সম্বন্ধ। মোট কথা, আমেরিকান স্কুলে যে-ভাবে ফলাও করে চমকপ্রদভাবে পাঠক্রম তৈরী করা হয়, যেখানে শিক্ষার বদলে শিক্ষার আড়ম্বরটাই বেশী, ভারতীয় মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রম তারই নকলে করা হয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রম সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে ৯ম শ্রেণীতেই ছেলে মেয়েদের Humanities, Science, Technical, Commerce, Agriculture, Fine Arts, Home Science—এগুলির মধ্যে একটা বেছে নিতে হবে। অর্থাৎ যে ছাত্র Humanities নেবে তাকে কেবল মাত্র ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ইত্যাদি পড়তে হবে, তার ফিজিক্স, কেমিষ্ট্রি, বায়োলজী, অর্থাৎ বিজ্ঞানের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই থাকবে না। অথচ বর্তমান যুগে বিজ্ঞান শিক্ষা ছাড়া পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা হতেই পারে না। যারা বিজ্ঞান বেছে নেবে, তাদের ইতিহাস ইত্যাদি আর পড়তে হবে না, অথচ তারা ভারতের কিম্বা বাংলার ইতিহাস পূর্বে কিছুই শেখেনি। তাছাড়া যে-সব ছাত্রছাত্রী Humanities নিয়ে স্কুল থেকে পাস করে বেরিয়ে আসবে তাদের পক্ষে ইঞ্জিনিয়ারিং, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি পড়া চিরকালের মত বন্ধ। পক্ষান্তরে যারা Science নিয়ে পাস করবে তাদের পক্ষেও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস, সাহিত্য, অর্থনীতি ইত্যাদি পড়ার পথ বন্ধ। মোটামুটিভাবে একটা পূর্ণাঙ্গ সাধারণ-শিক্ষা শেষ করার পূর্বেই এবং একটা অপরিণত বয়সে জীবন সম্বন্ধে যে-সময়ে ছাত্রছাত্রীদের কোনো ধরণাই হয়নি কিম্বা তাদের বোধ জন্মায়নি, সেই রকম বয়সে তাদের বাধ্য করা হচ্ছে ভবিষ্যৎ জীবনের পথ বেছে নিতে। এতে কত অসংখ্য ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ যে নষ্ট হবে এবং এই অসম্পূর্ণ শিক্ষার জন্য জাতির ভবিষ্যতের যে কতখানি ক্ষতি হবে তা বোধ হয় আমাদের নেতারা ভেবে দেখতে প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নি। আরও একটা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে-মুহূর্তে আমেরিকানরা তাদের শিক্ষা ব্যবস্থার দোষ বুঝতে পেরে তার আমূল পরিবর্তনের পথ খুঁজতে শুরু করেছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদের নেতারা আমেরিকানদের দ্বারা নিন্দিত শিক্ষা ব্যবস্থাটাই নকল করতে শুরু করে দিলেন!

---

(১) আমেরিকার একজন অগ্রগণ্য শিক্ষাবিদ Prof. Jaques Barzun এই প্রসঙ্গে বলেছেন: "The mind slithers with the subjects which it is anti-educational to call by their right names; not astronomy, geology, and physics, but 'Earth Science'; not English and French or reading and writing, or speaking & reciting, but 'Language Arts'; not history, civics and economics but 'Social Stuies'; not sociology and anthropology but 'Human Relations'; it is positive call for vagueness and trifling." (*The House of Intellect*, N. Y., 1959, p. 113)

এই পাঠক্রমের আর একটি গুরুতর দোষ হচ্ছে এই যে, পাঠ্য বিষয়গুলির (academic subjects) সঙ্গে unacademic বিষয়গুলিকে সমপর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। ঐচ্ছিক বিষয়গুলির মধ্যে Science, Humanities, Agriculture যেমন, Home Scienceও তেমনই। এতে "পড়তে" হবে গৃহস্থালীর কাজ, ধোপার কাজ, রন্ধনবিদ্যা, শিশুপালন ইত্যাদি। এই সব "বিদ্যা" আয়ত্ত করে মেয়েরা স্কুল পাস করার সার্টিফিকেট পাবে। বিষয়টি যাতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় তার জন্য এই পাঠক্রম-প্রণেতারা কতকগুলি মোটা মোটা ও দামী দামী অনেক চমকপ্রদ ছবিযুক্ত বিলেতী বই পাঠ্য করে দিয়েছেন, যথা : Household knowledge by Jane gordon, The Happy Home, the Housewife's Handbook ইত্যাদি।

কোনো সন্দেহ নেই যে মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রমে এই 'কোর্স'টির প্রবর্তন করা হয়েছে কেবল মাত্র মেয়েদের জন্য। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, ছেলেমেয়েদের মধ্যে সমশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা—নেই এই কথাটাই আমাদের নেতারা মেনে নিয়েছেন। এইরূপ শিক্ষার ফলে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবধান বেড়েই যাবে, সামাজিক ব্যবধানও কিছুমাত্র কমবে না। পাঠক্রমে প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণীয়। তিনি বলেছিলেন শিক্ষাবিষয়ে শিক্ষা করবার জন্য অন্য কোনো দেশে নয়, শুধু রাশিয়াতেই যাওয়া প্রয়োজন। যাঁরা ভারতীয় মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রম তৈরী করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সরকারী রবীন্দ্র-ভক্তও কিছু ছিলেন এবং মহাআড়ম্বরে তাঁরা রবীন্দ্র শতবার্ষিকীও উদ্‌যাপন করেছিলেন। কিন্তু শিক্ষার মত এইরকম একটা গুরুত্ব পূর্ণ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের কথায় তাঁরা কর্ণপাত করেন নি। শিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষা করার জন্য Indian Study Team গেলেন আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে—যে-সব দেশের সামাজিক অবস্থার সঙ্গে ভারতের কোনো সামঞ্জস্যই নেই। অথচ যে-সোভিয়েত আমাদেরই মতো অনগ্রসর সামাজিক অবস্থা থেকে শুরু করে শিক্ষার জোরে ২৫/৩০ বৎসরের মধ্যে শিক্ষায় ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে আজ শীর্ষস্থান অধিকার করেছে সেই দেশ থেকে, রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ সত্ত্বেও, Indian Study Team এবং অন্যান্য নেতারা কিছু শিখবার কথা চিন্তাও করলেন না—এটা তাঁদের জাতির প্রতি দায়িত্বজ্ঞানহীনতারই পরিচায়ক নয় কি ?

তাছাড়া কেবলমাত্র পশ্চিম জগতের কথাই যদি ধরা যায়, সেখানে ইংলণ্ড ও আমেরিকা ছাড়া শিক্ষায় ও বিজ্ঞানে উন্নত আর কোনো দেশ নেই কি ? ফ্রান্স ও জার্মানির শিক্ষা ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির কথা কি তাঁরা শোনেন নি ? যদি তাঁরা এই দুইটি দেশের দিকে একটু দৃষ্টিপাত করতেন তাহলে দেখতে পেতেন যে তাদের মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রম ইংলণ্ড ও আমেরিকার মতো খণ্ডিত নয়, সেখানে core subjects ও elective subjects বলে কিছু নেই। সকলের জন্য, ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে, একই পাঠক্রম।

জার্মানির দিকে তাকালে তাঁরা দেখতে পেতেন যে সেখানে তিন রকমের হাইস্কুল আছে : ১) Gymnasium যেখানে গ্রীক ও লাতিন ভাষার উপর খুব জোর দেওয়া হয়, বিজ্ঞানের বিষয়গুলিও পড়ান হয় ; ২) Realgymnasium যেখানে গ্রীকভাষা, বাদ, লাতিন-এর উপর জোর, বিজ্ঞানেও gymnasium থেকে বেশী জোর ; ৩) Oberrealschule যেখানে প্রাচীন ভাষা একেবারে বাদ, বিজ্ঞানে ও ফরাসী ও ইংরেজী ভাষায় জোর। বেশীর ভাগ জার্মান ছাত্রছাত্রীরা এই স্কুলেই পড়ে। তার পাঠক্রম নিম্নে দেওয়া হল :

ক্ষমতা দখল করার ৪ দিন পরে বলশেভিক সরকারের শিক্ষামন্ত্রী সুপণ্ডিত Lunacharsky সোভিয়েতে নূতন সমাজতান্ত্রিক শিক্ষানীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে সে একটি বিখ্যাত ঘোষণাপত্র প্রকাশ

করেছিলেন, তা বেশীর ভাগ পশ্চিমী পণ্ডিতদেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি, আর যাঁরা এসবের খবরা-খবর রাখতেন তাঁরাও এই ঘোষণা পত্রকে উপহাসের বস্তু বলেই গণ্য করেছিলেন।

কিন্তু ৩।৪ দশক পার হতে না হতেই যখন দেখা গেল যে, যে-দেশটা কয়েক বৎসর পূর্বেও একদা অনগ্রসর দেশ বলেই গণ্য হত, সেই রকম একটা দেশ অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে পশ্চিমের সব থেকে অগ্রসর দেশগুলিকে জ্ঞানবিজ্ঞানের অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে পশ্চাতে ফেলে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে তখন সেই সব পশ্চিমী পণ্ডিতদের বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। মহাকালের এমনই পরিহাস যে, যে অনগ্রসর সোভিয়েত দেশকে তার প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা কালে আমেরিকার ইঞ্জিনিয়ারীং ও কারিগরি সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল, সেই সোভিয়েত দেশই শিক্ষা ও শ্রমের জোরে ২৫ বৎসরের মধ্যে এত দূর অগ্রসর হয়ে গিয়েছে যে উল্টে আমেরিকাকেই আজ তার নিকট কারিগরি সাহায্যের জন্য দ্বারস্থ হতে হচ্ছে।

১৯৫৭ সালে ৪ঠা অক্টোবরে সোভিয়েত স্পুটনিকের মহাকাশ অভিযানে সফলতা অর্জনের পর আমেরিকার শিক্ষা জগতে সে "শিক্ষা বিপ্লব" ঘটল তার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই "বিপ্লবে" যে বিষয়টি পরিষ্কার ভাবে বেরিয়ে এসেছে তার সারমর্ম হল এই যে, সোভিয়েতের এই দ্রুত অগ্রতির মূল কারণ হল তার সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা।[1] কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির এমেরিটাল প্রফেসার George Counts এই প্রসঙ্গে খুব ঠিক কথাই বলেছেন:

"The growth of Soviet power would have been impossible in the absence of the phenomenal development of Soviet education. In fact, apart from the dictatorship itself, the program of organised education launched, molded, and expended by the Communist Party is the key to the understanding of this mighty colosus. More than any other great state in history, it has marshalled all the forces of organised education to achieve its purposes and advance towards its distant apocalyptic goals. ...From the moment the Bolsheviks consolidated their rule they have employed their full force of education not to maintain the **statusquo,** but to change the course of history and the nature of man. Here is one of the ineluctable facts of the contemporary world." (**Challengc** of Soviet Education, N. Y., 1957, p. 4)

অধ্যাপক কাউন্টস্ আরও বলেন যে, সোভিয়েত সরকার স্কুল কলেজ ছাড়াও সংবাদপত্র, পুস্তক পুস্তিকা, রেডিও, টেলিভিশন, লাইব্রেরী, পুস্তক প্রকাশনী, খেলার মাঠ, পার্ক, ক্লাব, মিউজিয়াম, থিয়েটার, ইত্যাদি সব জিনিসগুলিকেই সুপরিকল্পিত ভাবে শিক্ষার কাজে বিশেষভাবে ব্যবহার করে থাকে।

ক্ষমতা দখল করার পর বলশেভিকদের প্রচণ্ড বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল—গৃহযুদ্ধ, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির যুগপৎ আক্রমণ, দুর্ভিক্ষ, মহামারি দ্বারা। এই সময়কার অবস্থা বর্ণনা করে Sidney and

---

[1] "For the first time in history, the State Department is faced with an American Company's request to permit soviet engineers to come to this country to teach Americans to operate machinery, the design of which is also to be imported from the Soviet Union." (New York Herald Tribune, t5th March, 1956).

Beatrice Webb বলেছেন : "So great was the social devastation of 1914-21 that, for years, nearly all the schools & colleges in the U. S. S. R. sank down to the lowest depths, with the teachers on starvation wages ; destitute alike of proper accomodation and often even of heating, together with books & writing paper, ink and pencils." (Soviet Communism, II, p. 890)

এই সময়ে সোভিয়েতে জাতীয় পুনর্গঠনের পক্ষে যেটা সব থেকে বড় বাধারূপে দেখা দিল তা হল জনসাধারণের নিরক্ষরতা, স্কুল, কলেজ ও শিক্ষকের অভাব। জার আমল থেকে বলশেভিকরা শিক্ষাক্ষেত্রে যেরূপ অবস্থার উত্তরাধিকারী হলেন সেটা বাস্তবিকই শোচনীয়—অনেকটা ১৯৪৭ সালের ভারতেরই মত। শতকরা ৮০ জনেরও বেশী নিরক্ষর, অশিক্ষিত। ১৯১৪ সালে রুশ দেশে স্কুলের সংখ্যা ছিল মোট ১০৫, ৫২৪টি, তার মধ্যে ১০১, ৯১৭টি ছিল মাত্র ৩ বৎসরের প্রাইমারী স্কুল, ১,৬৫৪টি ৭ বৎসরের স্কুল, আর মাত্র ১,৯৫৩টি মাধ্যমিক স্কুল। বেশীর ভাগ শিক্ষার্থীই প্রাইমারী স্কুলও শেষ করত না। স্কুলে যাবার বয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে মাত্র এক-পঞ্চমাংশ স্কুলে যেত। সোভিয়েত নেতারা দেখলেন যে এই বর্বর অবস্থা থেকে অগ্রসর হতে হলে, দেশটাকে সমাজতান্ত্রিক দেশে পরিণত করতে হলে, তাঁদের প্রথমেই এই অশিক্ষা ও কুসংস্কারের জগদ্দল পাষাণটাকে উপড়ে ফেলতে হবে। শুরু হয়ে গেল দেশময় পূর্ণ উদ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণের অভিযান। এই ঐতিহাসিক যজ্ঞে সোভিয়েত নেতাদের অনেক বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু একটা চূড়ান্ত সুবিধাও তাঁদের ছিল। এইরূপ মহান কর্মে সর্বপ্রধান যে-বাধা জারের সামন্ততান্ত্রিক প্রাণহীন শাসনতন্ত্র। জমিদার, মহাজন, ধনী, মুনাফাভোগী, চোরাকারবারী, পাদ্রী, মোল্লা পুরুতদের কব্জা থেকে প্রলেটারীয়ান ডিকটেটরশিপের দৌলতে দেশ তখন সেই পক্ষাঘাতী বাধা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত, গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার পথ উন্মুক্ত।

১৯১৯ সালে ২০শে ডিসেম্বর লেনিন তাঁর বিখ্যাত ঘোষণাপত্র ("On the Liquidation of Illiteracy among the Population of RSFSR") প্রকাশ করলেন। তাতে লেনিন বললেন, "An illiterate person stands outside of politics, he must first be taught his ABC's." এই ঘোষণাপত্র লক্ষ লক্ষ কপি ছাপিয়ে দেশময় বিলি করা হল। শিক্ষিত ব্যক্তিরা, কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যরা, পাইওনিয়ার কমসোমলের ছেলেমেয়েরা, ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা ও লাল ফৌজের অফিসাররা সকলেই লেগে গেলেন নিরক্ষরতা দূরীকরণের অভিযানে। কারখানাগুলিতে নিরক্ষর শ্রমিকদের শিক্ষার জন্য তাদের কাজের সময় দু'ঘণ্টা কমিয়ে দেওয়া হল (তাদের বেতন না কমিয়ে)। নিরক্ষরতা দূরীকরণে লাল ফৌজ যে প্রসংশনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তা জগতের ইতিহাসে বিরল। জর্জ কাউন্টস্ বলেছেন : "Under the conditions of universal military service eventually adopted, the armed forces came to constitute a major educational institution, not only for the teaching of reading and writing, but also for raising the general cultural level and liquidating 'political illiteracy."[১]

---

(১) Ibid, p. 182, লালফৌজের শিক্ষার উদ্যমকে Webb দম্পতিও অনেক প্রসংশা করে গিয়েছেন : "At every military centre there are club-houses, school-rooms, lecture courses, libraries, theatres and cinemas. The aggregate number of volumes now (1935) included in the thousands of libraries of the defence forces is reported to be somewhere about 20 millions." (*Soviet Communism*, I, p.126)

সোভিয়েতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও ১৮ থেকে ৩৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত নিরক্ষর মেয়ে-পুরুষের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এইভাবে ১২ বৎসরের অক্লান্ত অভিযানের ফলে ১৯৩৪ সালে নিরক্ষরতা দূরীকরণ কমিটির সভাপতি Kalinin ঘোষণা করতে সক্ষম হলেন যে সোভিয়েত দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীভূত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে সোভিয়েতে যখন "পৃথিবীতে সবচেয়ে বড়ো ঐতিহাসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান" চলেছে ঠিক সেই সময়েই রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন সেই যজ্ঞে অংশ গ্রহণ করতে। সোভিয়েতের সমাজতান্ত্রিক জীবনের যে বিষয়টি সর্বাগ্রে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, তা হচ্ছে সেখানকার চিন্তায় ও কর্মে "অসম্ভব সাহস।" "রাশিয়ার চিঠি"তে লিখেছিলেন ঃ "যে-শিক্ষা আমাদের দেশে প্রচলিত তাতে করে আমাদের চিন্তা করার সাহস, কর্ম্ম করবার দক্ষতা থাকে না...বুদ্ধির সাহস এবং জনসাধারণের প্রতি দরদবোধ এই উভয়ের অভাব ঘটাতেই দুঃখীর দুঃখ আমাদের দেশে ঘোচানো এত কঠিন হয়েছে। ...কেরানী-তৈরির কারখানা বসাবার জন্যেই একদা আমাদের দেশে বণিক-রাজত্বে স্কুলের পত্তন হয়েছিল।...ঐ দেশের হাওয়াতেই আমিও তো মানুষ, সেই জন্যেই জোরের সঙ্গে মনে করতে সাহস হয়নি যে, বহু কোটি জনসাধারণের বুকের উপর থেকে অশিক্ষা ও অসামর্থ্যের জগদ্দল পাথর ঠেলে নামানো সম্ভব।...এই রকম স্বল্প সাহস মন নিয়েই রাশিয়াতে এসেছিলুম।" রবীন্দ্রনাথ শুনেছিলেন যে সেখানে চাষী ও শ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার হচ্ছে, পল্লীর পাঠশালায় শিশুশিক্ষার প্রথমভাগ বড়ো-জোর দ্বিতীয়ভাগ পড়ানো হচ্ছে ; তিনি ভেবেছিলেন সে যদি সেখানে শিক্ষিতের সংখ্যা কিছুটা বেড়ে থাকে তাহলে তাতেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন। ভারতবর্ষে শাসকদের নিকট তিনি কেবলই 'ডিফিকাল্‌টিজের' দোহাই শুনেছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নেও তো তখন 'ডিফিকাল্‌টিজের' অভাব ছিল না। "এরা একা, অত্যন্ত ভাঙাচোরা একটা রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বোঝা নিয়ে। পথ পূর্বতন দুঃশাসনের প্রভূত আবর্জনায় দুর্গম।...অর্থসম্বল এদের সামান্য—বিদেশের মহাজনী-গদিতে এদের ক্রেডিট নেই।...বস্তুত এদের সমস্যা বহু বিচিত্র জাতি-সমাকীর্ণ বহুবিচিত্র অবস্থা-সঙ্কুল বিশ্বপৃথিবীর সমস্যারই সংক্ষিপ্ত রূপ।"

সোভিয়েতে যেয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখলেন সেই দেশ "অন্য কোনো দেশের মতোই নয়। একেবারে মূলে প্রভেদ।" সেদেশের মানুষের সাহস দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। "সর্বপ্রথমেই মনে হয়, কী অসম্ভব সাহস। সনাতন বলে পদার্থটা মানুষের অস্থিমজ্জায় মনে প্রাণে হাজারখানা হয়ে আঁকড়ে আছে, তার কত দিকে কত মহল, দরজায় কত পাহারা...এরা তাকে একেবারে জটে ধরে টান মেরেছে—ভয় ভাবনা সংশয় কিছুই মনে নেই। সনাতনের গদি দিয়েছে ঝাঁটিয়ে, নূতনের জন্যে একেবারে নূতন আসন বানিয়ে দিলে। পশ্চিম মহাদেশ বিজ্ঞানের যাদুবলে দুঃসাধ্য সাধন করে, দেখে মনে মনে তারিফ করি। কিন্তু এখানে যে প্রকাণ্ড ব্যাপার চলেছে সেটা দেখে আমি সবচেয়ে বিস্মিত হয়েছি।...দেখতে পাচ্ছি বহুদূরব্যাপী একটি ক্ষেত্র নিয়ে এরা একটা নূতন জগৎ গড়ে তুল্‌তে কোমর বেঁধে লেগে গেছে। দেরি সইচে না, কেন না জগৎ জুড়ে এদের প্রতিকূলতা, সবাই এদের বিরোধী, যত শীঘ্র পারে এদের খাড়া হয়ে দাঁড়াতে হবে...হাজার বছরের বিরুদ্ধে দশ পনেরো বছরে জিতবে বলে পণ করেছে। অন্য দেশের তুলনায় এদের অর্থের জোর অতি সামান্য, প্রতিজ্ঞার জোর দুর্দ্ধর্ষ।"

সোভিয়েতের শিক্ষাবিধি দেখাই ছিল রবীন্দ্রনাথের সোভিয়েত ভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য। সেই শিক্ষা-

বিধি দেখে তিনি লিখেছিলেন ঃ “দেখে খুবই বিস্মিত হয়েছি। আট বছরের মধ্যে শিক্ষার জোরে সমস্ত দেশের লোকের মনের চেহারা বদলে দিয়েছে। যারা মূক ছিল তারা ভাষা পেয়েছে, যারা মূঢ় ছিল তাদের চিত্তের আবরণ উদ্‌ঘাটিত, যারা অক্ষম ছিল তাদের আত্মশক্তি জাগরূক, য্যরা অবমাননার তলায় তলিয়ে ছিল, আজ তারা সমাজের অন্ধকুটুরী থেকে বেরিয়ে এসে সবার সঙ্গে সমান আসন পাবার অধিকারী। এত প্রভূত লোকের যে এত দ্রুত এমন ভাবান্তর ঘটতে পারে তা কল্পনা করা কঠিন। এদের এতকালের মরা-গাঙে শিক্ষার প্লাবন বয়েচে দেখে মন পুলকিত হয়। দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত সচেষ্ট সচেতন। এদের সামনে একটা নূতন আশার বীথিকা দিগন্ত পেরিয়ে অবারিত—সর্বত্র জীবনের বেগ পূর্ণমাত্রায়। এরা তিনটে জিনিস নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত আছে—শিক্ষা, কৃষি এবং যন্ত্র। এই তিন পথ দিয়ে এরা সমস্ত জাতি মিলে চিত্ত, অন্ন এবং কর্ম্মশক্তিকে সম্পূর্ণতা দেবার সাধনা করচে।” আর এক চিঠিতে কবি লিখেছিলেন ঃ “সোভিয়েত রাশিয়াতে এসে দেখলুম এখানকার উন্নতির ঘড়ি আমাদেরই বন্ধ ছিল, অন্তত জনসাধারণের ঘরে —কিন্তু বহুশত বৎসরের অচল ঘড়িতেও আট দশ বছর দম লাগাতেই দিব্যি চলতে লেগেছে। এতদিন পরে বুঝতে পেরেছি—আমাদের ঘড়িও চল্‌তে পারতো কিন্তু দম দেওয়া হল না। ডিফিকাল্‌টিজের মন্ত্র আওড়ানোতে এখন থেকে আর বিশ্বাস করতে পারবো না।”

সোভিয়েত শিক্ষার চরিত্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ আর একটি চিঠিতে লিখেছেন ঃ “এখানে এসে দেখলুম এরা শিক্ষাটাকে প্রাণবান করে তুলেছে। তার কারণ এরা সংসারের সীমা থেকে ইস্কুলের সীমাকে সরিয়ে রাখে নি। এরা পাস করবার কিম্বা পণ্ডিত করবার জন্যে শেখায় না—সর্বতোভাবে মানুষ করবার জন্যে শেখায়।……এখানকার জনসাধারণ ভদ্র লোকের আওতায় একটুও ছায়া ঢাকা পড়ে নেই, যারা যুগে যুগে নেপথ্যে ছিল তারা আজ সম্পূর্ণ প্রকাশ্যে।……এরা মানুষ হয়ে উঠেছে এই কটা বছরেই।” সোভিয়েতের এই দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে ভারতের দুরাবস্থার কথা তুলনা করে কবি অধৈর্য্য হয়ে আবার বলেছেন ঃ “প্রায় সত্তর বছর আমার বয়স হল, এতকাল আমার ধৈর্যচ্যুতি হয়নি। নিজেদের দেশের অতি দুর্বহ মূঢ়তার বোঝার দিকে তাকিয়ে নিজের ভাগ্যকেই বেশী করে দোষ দিয়েছি। ……কতবার মনে হয়েছে আর কোথাও নয় রাশিয়ায় এসে একবার তোমাদের সব দেখে যাওয়া উচিত। ……কেবল শিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষা করতে যাওয়া আমাদের পক্ষে একান্ত দরকার।”

এখন দেখা যাক, যে-শিক্ষাবিধি রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা করবার জন্য এমন ভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যে-শিক্ষাবিধির দ্বারা সোভিয়েতের কোটি কোটি মানুষ ভাষা পেল, আশা পেল, দশ বৎসরের মধ্যে মানুষ হয়ে উঠল, সেই শিক্ষাবিধিটা কি? বলা বাহুল্য এই শিক্ষাবিধি হল সমাজতান্ত্রিক শিক্ষাবিধি যার মূলনীতিগুলি ১০০ বৎসর পূর্বে Marx ও Engels গোড়াপত্তন করে গিয়েছিলেন।

Marx এর মতে সমাজতান্ত্রিক শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র চিন্তার উৎকর্ষ সাধনই নয়, চিন্তার সঙ্গে কর্মের সংযোগ স্থাপনও বটে। তিনি বলেছিলে ঃ “Just as in natur itself the head and the arms belong to one and the same organism, so mental and manual labour also combined in the process of work.” শিক্ষার মাধ্যমে সে বিদ্যা ও কর্মের সংযোগ স্থাপন করতে পারলেই মানুষের উৎপাদন ক্ষমতাও যেমন বাড়বে তার পূর্ণাঙ্গ নৈতিক ও মানষিক বিকাশ ও ঘটবে। Engels বলেছিলেন যে “in socialist society work and education will be combined and in this way this the growing generations wil be assured an all-round technical education as well as a practical foundation for scientific upbringing."

মানসিক শ্রম ও শারিরীক শ্রমের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা প্রতিটি মানুষের বিকাশের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক। শাসকশ্রেণীর বিদ্যার্জনের একচেটিয়া অধিকার এবং শ্রমজীবী মানুষের কেবলমাত্র শারীরিক শ্রমেই অধিকার এইরূপ ব্যবস্থা ব্যক্তি ও সমাজের অগ্রগতি ও বিকাশের পক্ষে সব থেকে বড় বাধা।

Marx তাঁর ১৮৪৪ থেকে ১৮৪৬ সালের লেখাগুলিতে (এবং পরবর্তীকালে capital এও) দেখিয়েছিলেন যে শ্রেণী বিভক্ত সমাজে মানুষ নানাভাবে নিজের ব্যক্তিত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরে। এই বিচ্ছিন্নতা (alienation or estrangement) তখনই ঘটে যখন মানুষ তার উৎপাদক-যন্ত্র (instrument of production) থেকে বঞ্চিত হয়। মানুষের (শ্রমজীবীর) পক্ষে উৎপাদক যন্ত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থ হচ্ছে যে সে তার শ্রমের ফল উৎপাদিত দ্রব্য হতেও সে বঞ্চিত হচ্ছে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন হচ্ছে লাভের জন্য পন্যদ্রব্যের উৎপাদন। এই পন্যদ্রব্য উৎপাদন করছে শ্রমিক তার শ্রমের দ্বারা। কিন্তু যে পন্যদ্রব্য শ্রমিক তার শ্রমের দ্বারা উৎপাদন করলো. শ্রমিক তার মালিক হল না. তার মালিক হল যে মূলধণের মালিক শ্রমিকের উৎপাদন যত বাড়তে থাকে মূলধনীর শক্তি ও তত বাড়তে থাকে, এবং শ্রমিকের নিজের শক্তি সেই অনুপাতে কমতে থাকে। এইভাবে শ্রমিক যে শক্তির সৃষ্টি করে সে তারই হয় বলি। Marx এর কথায় ঃ

"The worker becomes all the poorer the more wealth be produces, the more his production increases in power & range. The worker becomes an ever cheaper commodity the more commodities he creates. With the **increasing value** of the world of things proceeds in direct proportion the **devaluation** of the world of men……This fact expresses merely that the object which labour produces labour's product—confronts it as something **alien**, as a power **independent** of the producer." (Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, p. 69) যে মানুষ (শ্রমিক) তার নিজের উৎপাদিত দ্রব্য থেকে বিচ্ছিন্ন, সে তার নিজের সত্তা থেকেও বিচ্ছিন্ন। এমন কি সে নিজের শ্রমেরও আর মালিক নয় ; তার শ্রমের মালিক আর এক ব্যক্তি। এইভাবে বেদখল (expropriation) হওয়াটা একেবারে মানুষের প্রানশক্তিকেই [essence of man] আঘাত করে। শ্রমের প্রকৃত আকার মানুষের আত্ম উপলব্ধির (self fulfillment) ও তার অন্তর্নিহিত শক্তিগুলির পূর্ণ বিকাশের মাধ্যম। কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রম শ্রমিকের মানবীয় বৃত্তিগুলিকে পঙ্গু করে দেয় তার প্রচ্ছন্ন শারিরীক ও মানসিক শক্তিগুলি স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের সুযোগ না দিয়ে তার শরীর ও মনকে কেবলমাত্র নিগৃহীতই করে ; শ্রমিকের প্রাণশক্তির প্রতিষ্ঠা (affiamation) না হয়ে তার বিরেধীতা সাধন হয়। মোটকথা, ধনবাদী সমাজে শ্রমের প্রণালি মানুষের সমস্ত বৃত্তিগুলিকে বিকৃত করে, সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দারিদ্র, দুঃখ, দৈন্যের বৃদ্ধি পায় এবং সর্ব শেষে যন্ত্রের অগ্রগতির (technological progress) পরিণতি হয় মানব-জগতে মৃতপদার্থের প্রভুত্বের বিস্তার ('the rule of dead matter over the 'human world')।

Marx বলেছেন ঃ "As a result, therefore, man (the worker) no longer feels himself to be freely active in any but his animal functions—eating, drinking, procreating, or at most in his dwelling and in dressing-up, etc ; and in his human functions he no longer feels himself to be anything but an animal. What is animal becomes human and what is human becomes animal. Certainly eating, drinking, procreating etc. are also genuinely human functions. But in the abstraction which separates them from the sphere of all other human activity and turns them into sole and ultimate ends, they are animal." (Marx, ঐ পৃঃ ১৩)

ধনতান্ত্রিক সমাজের এই প্রক্রিয়া শ্রমিকের (the expropriated producer) পক্ষেও যেমন প্রজোয্য পুঁজিপতির (the appropriator of labour) পক্ষেও তেমনই প্রযোজ্য। এই বিচ্ছিন্নতা সর্বস্তরের মানুষকেই অভিভূত করে, তাদের স্বাভাবিক মানবিক বৃত্তিগুলিকে বিকৃত করে। মানুষের যে বোধশক্তিগুলি (senses) তার স্বাধীনতা, সুখ. আনন্দের উৎস হওয়া উচিত, তা কেবলমাত্র 'অধিকার ভোগের একটা আকাঙ্ক্ষায়, (Sense of possessing) পর্যবসিত হয়। যে কোনো বস্তুকে আত্মসাৎ করা যায়, কি যায় না—এই হয়ে দাঁড়ায় মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী। এইরূপ সমাজ ব্যবস্থায় "The only wheels (which the capitalist mode of production) sets in motion are avarice and the war amongst the avaricious competition." (ঐ, পৃঃ ৬৮)

কিন্তু মানুষের সহজাত স্বভাব প্রতিযোগিতা নয়, সহযোগিতা। তার শ্রম কেবলমাত্র একটা অর্থনৈতিক কর্মই নয়, কেবলমাত্র জীবন ধারণের জন্যই নয়; শ্রম হচ্ছে তার সামগ্রিক অস্তিত্বের জন্য কর্ম (existential activity), তার মনুষ্য চরিত্র, বৃত্তি ও শক্তি—এক কথায় মানুষের "বিশ্বচরিত্রকে" (universal nature) বিকশিত করার জন্য কর্ম। বিশ্বজনীনতাই হচ্ছে মানুষের চরিত্র। মানুষ তখনই স্বাধীন হবে যখন সব মানুষ স্বাধীন হবে, মানুষ যখন বিশ্বজনীন মানুষ হবে। কিন্তু Marx এর মতে সমস্যাটা কেবলমাত্র একটা দার্শনিক সমস্যাই নয়। কারণ আত্ম-উপলব্ধির জন্য মানুষের এখন প্রয়োজন বর্তমান ধনতান্ত্রিক জগতের শ্রম-প্রণালির (mode of labour) বিলোপ সাধন ঘটান, সেটা হচ্ছে একটা অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা। মানুষের সমাজ জীবনের এই সব প্রধান সমস্যার Marx তাঁর Capital-এ আলোচনা করেছেন। বিচ্ছিন্নতা তার সব থেকে বেশী বিশ্বজনীন রূপ নিয়েছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ব্যবস্থার মধ্যে। এই ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ করে দিয়েই বিচ্ছিন্নতার অপসরণ করে দেওয়া যেতে পারে। Marx এর নিকট, ব্যক্তিগত সম্পত্তি লোপ করাটাই প্রধান উদ্দেশ্য নয় (not an end in itself), বিচ্ছিন্ন শ্রমের বিলোপ সাধন করার জন্যই ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ করা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত সম্পত্তি হচ্ছে বিচ্ছিন্ন শ্রমের ফল ব্যক্তিগত সম্পত্তি (অর্থাৎ শ্রেণী) বিলুপ্ত হলে মানুষ তার সার্বজনীন চরিত্র লাভ করবে। "Private property thus results by analysis from the concept of **alienated labour**—ie, of **alienated man**, of estranged labour, of estranged life, of estranged man." (ঐ, পৃঃ ৮০)।

এই প্রসঙ্গে Marx আরও বলেছেন: "The positive transcendence of **private property** as the appropriation of **human** life is, therefore, the positive transcendence of all estrangement—that is to say, the return of man from religion, family, state, etc, to his **human**, ie, social mode of existence.” (পৃঃ ১০৩)।

মানুষের এই বন্ধন-মুক্ত, আত্ম-উপলব্ধিত বিশ্বরূপের Marx নাম দিয়েছেন কমিউনিজম। **“Communism as the positive** transcendence of **private property**, as **human self-estrangement**, and therefore as the real **appropriation of the human** essence by and for man ; communism therefore as the complete return of man to himself as a **social** (ie, human) being—a return become conscious ; and accomplished within the entire wealth of previous development. This communism, as fully developed naturalism, equals humanism, and as fully developed humanism equals naturalism ; it is the **Genuine** resolution of the conflict between man and nature and between man and man—the true resolution of the strife between existence and essence, between objectification and self-confiirmation, between freedom and necessity, between individual and species. Communism is the riddle of history solved.” (পৃঃ ১০২)। উপরের আলোচনা থেকে একটা কথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে Marx-এর মতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভিত্তিক সমাজব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা স্থাপন না করা পর্য্যন্ত মানুষের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার ব্যবস্থা হতে পারে না। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই মানুষের মানসিক নৈতিক শারীরিক ক্ষমতা ও তার সৌন্দর্যবোধের পূর্ণ বিকাশ হওয়া সম্ভব।

পূর্বেই আমরা লক্ষ্য করেছি যে Marxএর মতে শ্রমের দ্বারাই মানুষ নিজেকে উপলব্ধি করতে পারে। সুতরাং Marxএর শিক্ষাতত্ত্বে শ্রমের স্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই মার্ক্সীয় শিক্ষাতত্ত্বে মনের শ্রমের (work with the mind) সঙ্গে দৈহিক শ্রমের (work with the hand) সংযোগ তত্ত্বের (theory) সঙ্গে কার্যের (practice) সংযোগ একেবারে মৌলিক এবং এই কথা Communist Manifestoতেই বলা হয়েছে : “Free education of all children in public schools. ……Combination of education with industrial production. Capital এও মার্ক্স “combination of children’s education with the productive labour”[1] এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেকবার উল্লেখ করেছেন। ১৮৬৪ সালের ব্রিটিশ ফ্যাক্টরী এক্টের আলোচনা করে মার্ক্স আবার বলেছেন : “The sencess of these clauses proved for the first time the possibility of combining education and gymnastics, with manual labour and, consequently, of combining manual labour with education and gymnastics. Factory inspectors soon found out by questening the schoolmasters, that the factory children, although receiving only one half the education of the regular day scholars, yet learnt quite as much & often more. ……From the Factory system budded, as Robert Owen has shown us in detail, the germ of the education of the future, an education that will, in the case of every child over a given age, combine productive labour with instruction & gymnastics, not only as one of the methods of adding to the efficiency of production, but as the only method of producing fully developed human beings."[২]

---

[1] Marx : Capital, I, Moscow, 1954, p. 299

Peter Koropokin এনার্কিষ্ট মতাবলম্বী হলেও অনেক বিষয়ে মার্ক্সবাদের সঙ্গে তাঁর মিলও ছিল। তিনি তাঁর বিখ্যাত Fields, Factories and Workshop-এ (১৮৯৯) সমাজতান্ত্রিক শিক্ষার রূপ কি হবে সে সম্বন্ধে লিখেছিলেন : "To the division of society into brain-workers and manual-workers we oppose the combination of both kinds of activities ; and instead of "Technical education" which means the maintenance of the present division between brain work and manual work, we advocate **éducation intégrale**, or complete education, which means the disappearance of that pernicious distinction. Plainly started the aims of the school under this system ought to be the following—to give such an education that on leaving school of the age of eighteen or twenty, each boy and each girl should be endowed with a through knowledge of science—such a knowledge as might enable them to be useful workers in science—and at the same time, to give them a general knowledge of what constitutes the bases of technical training, and such a skill in some special trade as would enable each of them to take his or her place in the grand world of the manual production of wealth."

অন্তর্দ্বন্দ্বময় ধনবাদী সমাজ মানসিক শ্রম ও শারীরিক শ্রমে বিভক্ত হওয়ার ফলে সেখানে ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ও বিকাশ সম্ভব নয়। ধনবাদী-সমাজের-সাধারণ সংকট---শিক্ষা ক্ষেত্রেও যে কিরূপ প্রতিকারহীন ভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে তা "মানব মনের" পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলিতে আলোচনা হয়েছে। ধনবাদী সমাজ স্বভাবতই তার status quo বজায় রাখতে উদগ্রীব, কিন্তু যুগের অগ্রগতির ফলে তার status quo সর্বদাই বিপদাপন্ন ; বিজ্ঞানের বহুমুখী বিস্তারের ফলে বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার অধিকতর প্রয়োজন, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে এরূপ শিক্ষা বিস্তারে এই সমাজ অক্ষম ; একধারে শারীরিক ও মানসিক শ্রমের ক্রমবর্দ্ধমান ব্যবধান ; অন্যধারে অধিকতর সংকীর্ণ-কারিগরী শিক্ষা ; একধারে "বিশুদ্ধ" তত্ত্ব, অন্যধারে অনিষ্টকর প্রয়োগ। ধনতন্ত্রের এই সমস্ত অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের কোন সমাধান নেই। ব্যক্তিগত সম্পত্তিহীন সমাজতন্ত্রেই এইসব অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধান সম্ভব। ধনবাদী সমাজের এইসব অন্তর্দ্বন্দ্ব, মানসিক শ্রমের সঙ্গে শারীরিক শ্রমের বিচ্ছিন্নতা মানসিক শ্রমকে শাসক শ্রেণীর একচেটিয়াভূক্ত করা ইত্যাদি মানব জাতির মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় বাধা। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাই এরূপ আত্মঘাতি পরিস্থিতি থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে পারে এবং সমাজতান্ত্রিক শিক্ষার দ্বারা তার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দিতে পারে। সুতরাং মার্ক্সবাদ অনুসারে শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রে মানসিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ঘুচে যাবে ও তাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপতি হবে, এবং তখনই মানুষ সর্বক্ষেত্রে তত্ত্ব ও প্রয়োগের (theory and practice) সমন্বয় বিধানের জন্য একটা ব্যাপক ও অখণ্ড

---

2. Ibid, pp 482-84.

শিক্ষার সুযোগ পাবে। এই শিক্ষা ব্যবস্থার নাম হল politechnical শিক্ষা[১]। এই politechnical শিক্ষাই হল মার্ক্সীয় শিক্ষা দর্শনের অন্তস্থল। স্বভাবতই মার্ক্সবাদ একতরফা পুঁথিবিদ্যা অথবা তত্ত্ববর্জিত সংকীর্ণ বিশেষজ্ঞ শিক্ষার বিরোধী। এই দর্শনে, অন্যান্য সব ক্ষেত্রেই যেমন, শিক্ষা ক্ষেত্রেও তত্ত্ব ও প্রয়োগের ঐক্যের উপরই জোর ; তত্ত্বের প্রয়োগ সম্বন্ধে দৃষ্টি দিতে হবে, তত্ত্ববিদ্যা আয়ত্ত করবার জন্যও প্রাণপণ করতে হবে। বস্তুত, politechnical শিক্ষার মূল কথাই হচ্ছে যে অঙ্কশাস্ত্র, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীবতত্ত্ব ইত্যাদি স্কুলে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করা এবং স্কুলে পঠিত এই তত্ত্ববিদ্যার সঙ্গেই সামঞ্জস্য রেখে স্কুল শিক্ষারই অন্তর্গত প্রয়োগবিদ্যার ব্যবস্থা অবলম্বন করা। অর্থাৎ এই শিক্ষা সংগঠিত হবে দেশে প্রধান প্রধান বৈদ্যুতিক রাসায়নিক, যন্ত্রোৎপাদক কারখানা ও বড় বড় কৃষি সংস্থার ন্যায় বৃহৎ উৎপাদক শক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ সাধন করে।

বলশেভিক পার্টির অস্তিত্বে প্রথম থেকেই লেনিন ও অন্যান্য নেতারা মার্ক্সীয় শিক্ষা নীতির উপর বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়েছিলেন। ১৯০৩ সালে লেনিনের নেতৃত্বে রুশীয় সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি শিক্ষার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ১৯১৭ সালে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর অস্থায়ী সরকারের নিকট শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠনের জন্য লেনিন একটি স্মারকলিপি দিয়েছিলেন। ক্ষমতা দখল করে দেশকে পুনর্গঠন করার জন্য লেনিন লুনাচারস্কি, কালিনিন, ক্রুপ্‌স্কাইয়া, স্টালিন প্রভৃতি সকলেই শিক্ষা বিজ্ঞান ও শ্রমের উপরই সব থেকে বেশী জোর দিলেন। সংবাদ পত্র, রেডিও ও মঞ্চ থেকেও এই একই অভিযান চলল। ১৯১৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টির ৮ম কংগ্রেসে সোভিয়েতে জন শিক্ষা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মূলনীতিগুলি ঘোষণা করা হল : শ্রেণী বিভক্ত বুর্জোয়া সমাজের বিলুপ্তি সাধনের জন্য ও সমাজের শ্রেণীহীন কমিউনিষ্ট পুনর্জন্মের জন্য স্কুলগুলিকে কাজে লাগান হবে ; ১৭ বৎসর পর্যন্ত প্রত্যেক বালক ও বালিকার জন্য বিনা খরচায় বাধ্যতামূলক সাধারণ ও পলিটেকনিকাল শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে ; মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা হবে ; শিক্ষা সর্বপ্রকার ধর্মীয় প্রভাব হতে মুক্ত হবে ; বালক বালিকাদের জন্য সহশিক্ষা ও সমশিক্ষার ব্যবস্থা হবে, এবং তারা সকলে একই শিক্ষা লাভ করবে ; সোভিয়েতের সমস্ত জাতি ও তাদের ভাষা ও কৃষ্টিকে সমান বলে গণ্য করা হবে ; প্রতিটি জাতি তার নিজের মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ করবে ; মার্ক্সবাদ লেনিনবাদের ভিত্তিতে স্কুলগুলিতে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠনের শিক্ষা দেওয়া হবে।

বলা বাহুল্য এই শিক্ষানীতি সোভিয়েতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রথম থেকেই প্রয়োগ

---

(১) এই বিষয়ে একজন আমেরিকান বিশেষজ্ঞ, Dr, Nicholas Dewitt লিখেছেন : “Marx had no facet for separate labour education, and to him labour education and education of labour were one and the same and were embodied in the politechnical principle of education, which along with aesthetic and physical education, form the three pillars of communist education. It presupposes that on the road to communism as economic abundance emerges, as technology and the automation of industrial production progresses in creating this abundance, the division of labour & specialization will disappear. Every individual will not only have but will actively **seek** a universal and and all-sided education of the politechnical type which will free him from the inferiority of a one-sided development.” (**Harvard Educational Review,** Spring 1960)

করা হয়েছে। সোভিয়েতে প্রথম থেকেই সাধারণ শিক্ষায় বৈজ্ঞানিক ও বিশ্বমানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর জোর দেওয়া হয়েছে।[১] সোভিয়েতের প্রথম প্রেসিডেন্ট কালিনিন সোভিয়েতবাসীদের সম্বোধন করে বলেছিলেন——"make the entire heritage of human culture your own, master the heights of science & technology, raise yourself to the summits of knowledge and become the best educated people in the world."[২]

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় ষ্টালিন দেশের যুবশক্তিকে নির্দেশ দিলেন—জ্ঞানবিজ্ঞানের দুর্গ জয় কর—পড়ো, পড়ো, পড়ো : "Before us stands a fortress. This fortress is called science with its many branches of knowledge. The fortress we must capture at any cost....To master science, to forge the new personnel of Bolshevik specialists in all branches of knowledge, to study, to study, to study most stubbornly—such now is the task." (Stalin's address at the 8th All Union Congress of the Young Communist League, May 1928).

* CURRICULUM OF THE OBERREALSCHULE

No. of Lessons per week in different subjects

				Lower	Upper	Lower	Upper	Lower	Upper	Total
	IV	V	IV	III	III	II	II	I	I	
Religion	3	2	2	2	2	2	2	2	2	19
German	5	4	4	3	3	3	4	4	4	34
French	6	6	6	6	6	5	4	4	4	47
English	—	—	—	5	4	4	4	4	4	25
History & knowledge of earth	2	2	2:2	2:2	2:2	1:2	3	3	3	28
Arithmatic & Mathematics	5	5	6	6	5	5	5	5	5	47
Description of Nature	2	2	2	2	2	2	—	—	—	12
Physics	—	—	—	—	2	2	3	3	3	13
Chemistry & Minerology	—	—	—	—	—	2	3	3	3	11
Writing	2	2	2	—	—	—	—	—	—	6
Freehand Drawing	—	2	2	2	2	2	2	2	2	16
Total	25	25	28	30	30	30	30	30	30	258

* ৫০ পৃষ্ঠার শেষের প্যারাগ্রাফ দ্রষ্টব্য।

---

(১) রবীন্দ্রনাথের মতো Sidney and Beatrice Webbও সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক শিক্ষার বিশ্বজনীনরূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন : "The most important feature (of Soviet education) is the extraordinary universalism of the system. ...There is no other fragment of the earth's surface at all comparable in extent, in which anything like this conception of an educational service prevails." (**Soviet Communism**. II, p. 891) Eduard Herriot, ফ্রান্সের র‍্যাডিকাল পার্টির নেতা ও একাধিকবার প্রধানমন্ত্রী সোভিয়েত ভ্রমণ করে সেখানকার শিক্ষা সম্বন্ধে বলেছিলেন—"Soviet rule has bestowed on science all the authority of which it deprived religion."

(২) On Communist Education, p. 30.

Soviet 7 year and 10 year school curriculum (1956). Hours of Instruction per week by subjects in each Grade, in class hours of 45 minutes each and in per cent. (From Korolev : Education in the USSR, Soviet Land Booklets, New Delhi, 1958, p. 18

Subjects	Hours per week							Total 7 grades		Hours per week			Total VIII—X		Hours and per cent I—X	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	Hours	per cent	VIII	IX	X	Hrs.	per cent	Hrs.	per cent
Russian Language & Literature	13	13	13	9	9	8	6	2,343	36·6	5	4	4	445·5	13·6	2,788	28·8
Mathematics	6	6	6	6	6	6	6	1,386	21·7	6	6	6	594	18·2	1,980	20·5
History	—	—	—	2	2	2	2	264	4·1	4	4	4	396	12·1	660	6·8
USSR Constitution	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	33	1·0	33	0·3
Geography	—	—	—	2	3	2	2	297	4·6	2	3	—	181·5	5·6	497	5·0
Biology	—	—	—	2	2	2	3	297	4·6	2	1	—	99	3·0	396	4·1
Physics	—	—	—	—	—	2	3	165	2·6	3	4	4	379·5	11·6	544	5·6
Astronomy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	33	1·0	33	0·3
Chemistry	—	—	—	—	—	—	2	66	1·0	2	3	4	280·5	8·6	347	3·6
Psychology	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	33	1·0	33	0·3
Foreign Language	—	—	—	—	4	4	3	363	5·7	3	3	3	297	9·1	660	6·8
Physical Culture	2	2	2	2	2	2	2	462	7·2	2	2	2	198	6·1	660	6·8
Drawing (Art)	1	1	1	1	1	1	—	198	3·1	—	—	—	—	—	198	2·1
Drafting (Engineering)	—	—	—	—	—	—	1	33	0·5	1	1	1	99	3·0	132	1·4
Singing	1	1	1	1	1	1	—	198	3·1	—	—	—	—	—	198	2·1
Manual Training	1	1	1	1	2	2	2	330	5·2	—	—	—	—	—	330	3·4
Shop Work	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	198	6·1	198	2·1
Excursion	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	188	2·0
Total	24	24	24	26	32	32	32	6,402	100·0	33	33	33	3,267	100·0	9,857	100·0

সোভিয়েত স্কুল পাঠক্রমে যে বিষয়টি সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হচ্ছে যে তাকে কৃত্রিম উপায়ে খণ্ডিত করা হয়নি, আমেরিকায় ও ভারতবর্ষে যেমন করা হয়েছে Humanities, Science ইত্যাদি নাম দিয়ে। সোভিয়েত পাঠক্রম একটি পূর্ণাঙ্গ পাঠক্রম—এখানে কোনো core subjectও নেই, elective subjectও নেই। পাঠক্রমের সব বিষয়বস্তুই সকল ছাত্রছাত্রীর পক্ষে বাধ্যতামূলক। বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, বিদেশী ভাষা ইত্যাদি সকল ছাত্রকেই পড়তে হবে, তাতে বাছাবাছি করবার কিছু নেই। বর্তমান যুগোপযোগী জীবনের পক্ষে সংস্কৃতিতে ও বিজ্ঞানে যে সব মৌলিক জ্ঞানের প্রয়োজন তা'ই এই পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ৭ বৎসরের প্রাথমিক স্কুলেই সোভিয়েত শিক্ষার্থীকে ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক ছাড়াও শিখতে হয় ৪ বৎসর জীবতত্ত্ব, দুই বৎসর পদার্থবিদ্যা, ১ বৎসর রসায়ন ও ৩ বৎসর একটা বিদেশী ভাষা, মাধ্যমিক স্কুলে ঐ সব বিষয়গুলি হতেই আরও অগ্রসর হতে হয়, উপরন্তু ১ বৎসর গ্রহবিজ্ঞানও পড়তে হয়।

বলা বাহুল্য যে প্রত্যেক সোভিয়েত স্কুলেই সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই পলিটেকনিক শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মস্কো শহরের স্কুলগুলিতে ১,৫০০ সুসজ্জিত ইলেকট্রিকাল মেকানিকাল ইত্যাদি কারখানা রয়েছে।[১] একটি আমেরিকান গবেষণামূলক রিপোর্টে সোভিয়েতে পলিটেকনিকাল শিক্ষা; সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে এই শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্বিবিধঃ "to prepare the students who will go on to institutions of higher education and, in the same course of study, to provide specific skills for those going directly into production work. ...There also have been introduced field trips to various productive activities, manual training (grades 1 to 4), practical work in experimental plants & shops (grades 5 to 10) and advanced practical work in the broader aspects of agriculture, machinery and electricity (grades 8 to 10). Throughout, the purpose is to give students a basic idea of the technology of modern production industrial & agricultural, and to graduate semi-skilled techinicians or students who will be prepared for further specialised techincal traning." (RSFSR, Vol II, New Haven, p. 519.

১৯৫৬ সাল থেকে স্কুলগুলিতে শারীরিক কাজের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং ৮ম, ৯ম, ১০ম শ্রেণীর জন্য এই কাজ "Fundamentals of Industrial and Agricultural Production" নাম দিয়ে এইভাবে পুনর্গঠিত করা হয়েছে : (Korolev, p, 13)

Urban School	Rural School
8th Form : Machine Study—119 hours	Plant Growing—60 hours
9th Form : Fundaments of industrial production at a particular enterprise—136 hours	Agricultural Study—59 hours
	Livestock breeding—68 hours
10th Form : The Motor Car—69 hours	One particular branch of agriculture—68 hours
Electromechanic—63 hours	The Tractor (or motor car)—68 hours
	Electrotechinque—63 hours

---

[১] John Gunther অনেকবার সোভিয়েতে গিয়েছেন। ১৯৫৮ সালে তাঁর বই Inside Russia todayতে তাঁর এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে লিখেছেন যে "In the 9th grade boys learn to take a motor car engine apart (and put it together), with an actual car in the class-room." (p. 286)

"Fundamentals of Production" বিষয়টি ছাড়াও গ্রামের ছাত্রদের প্রতি ক্লাসে দুই সপ্তাহ (প্রতিদিন ছয় ঘণ্টা) ধরে চাষের কাজে প্র্যাকটিকাল ট্রেনিং নিতে হয়। সহরের ছাত্রদেরও এই ভাবে দুই সপ্তাহে যৌথ খামারে কাজ করতে হয়। নূতন পাঠক্রমে সব স্কুলে প্রতি বৎসর ৬ দিনের জন্য excursionএর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ভাবে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পলিটেকনিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বলে সোভিয়েতে গণ্য করা হয়।

সোভিয়েত মাধ্যমিক শিক্ষার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল Technicum শিক্ষা। এই টেক্‌নিকামগুলির উদ্দেশ্য হল শিল্প, কৃষি, রেলওয়ে হাসপাতাল আফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য মধ্যম শ্রেণীর বিশেষজ্ঞদের শিক্ষা ব্যবস্থা করা। পূর্বে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে বহু ছাত্রছাত্রী টেক্‌নিকামে প্রবেশ করত এবং বিষয় অনুযায়ী ২ থেকে ৪ বৎসর তাদের পড়তে হত। বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করার পর অনেক ছাত্র টেক্‌নিকামে যায়; এদের পড়তে হয় এক কিম্বা দুই বৎসর। টেক্‌নিকামের বৈশিষ্ট্য হল যে এগুলি কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞ শিক্ষাই দেয় না; উপরন্তু সাধারণ স্কুলের মতন মূল বিষয়বস্তুগুলি শিক্ষা দেবারও ব্যবস্থা করে। বস্তুত টেক্‌নিকামের সাধারণ শিক্ষার মান সাধারণ স্কুলেরই সমান। সাধারণ স্কুলের মতন টেক্‌নিকামের শিক্ষার্থীদেরও সরকারী পরীক্ষা পাস করতে হয়। টেক্‌নিকাম পরীক্ষায় যাদের ফল "excellent" হয় তারা সোজা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেয়ে ভর্তি হতে পারে; অন্যান্যরাও ৩ বৎসর কাজ করার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারে। ৭৬ রকমের বিশেষজ্ঞ এই টেক্‌নিকামগুলিতে শিক্ষা লাভ করে। ১৯৫৬ সালে এই সব ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৭৬ জন ১৮৫ থেকে ৪৯০ রুবল পর্যন্ত বৃত্তি পাচ্ছিল, এবং ঐ সালে টেক্‌নিকামের ছাত্র সংখ্যা ছিল ২০ লক্ষের উপর। টেক্‌নিকামের শিক্ষকদের প্রারম্ভিক বেতন ১,৩০০ থেকে ১,৪০০ রুবল এবং যারা টেক্‌নিকামের পরীক্ষা পাশ করে কাজ শুরু করে তাদের নিম্নতম মাসিক বেতন ১০০০ রুবল।

আমেরিকা কিম্বা অন্য কোনো পশ্চিমী দেশে সোভিয়েত টেকনিকামের সমতুল্য কোনো শিক্ষা ব্যবস্থা নেই। পশ্চিমে যারা বিশেষজ্ঞ শিক্ষালাভ করে, প্রথমত সংখ্যায় তারা সোভিয়েতের তুলনায় অনেক কম, আর দ্বিতীয়ত তারা কোনো সাধারণ শিক্ষা লাভ করে না, করলেও খুব সামান্য। এই প্রসঙ্গে বহুদিন পূর্বে ১৯৫৪ সালে Benjamin Fine "Russia is overtaking U.S. in Training of Technicians" নামক প্রবন্ধে লিখেছিলেন: "The Soviet Union has built a vast net work of intermediate technical training schools. As nearly as can be estimated there are 3,700 such schools with an enrollment of 1, 600,000 students. In the United there are approximately 1,000 2-year techincal schools with an enrollment slightly under 50,000" (New york Times, 7 Nov, 1954). বলা বাহুল্য এই ব্যবধান গত কয়েক বৎসরের মধ্যে আরও ব্যাপকতর ও গভীরতর হয়েছে।

সোভিয়েতে বাধ্যতামূলক শিক্ষা ছিল এতদিন পর্য্যন্ত ৭ম ক্লাস পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত। ১৯৫৭ সালে বড় বড় সহরগুলিতে ১০ম ক্লাস অর্থাৎ ১৭ বৎসর পর্য্যন্ত বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং শীঘ্রই সমস্ত দেশময় সম্পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষাটাই ব্যধ্যতামূলক করা হবে। জারের শাসনকালে আমলারা বলতেন যে দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করতে তাঁদের ১৫০ বৎসর সময় লাগবে। সোভিয়েত সরকার ১০ বৎসরেরও কম সময়ে সে কাজ সমাধান করেছিল। বর্তমানে বিনা খরচায় সমগ্র মাধ্যমিক শিক্ষাটাও

যে সোভিয়েতে বাধ্যতামূলক করার চেষ্টা হচ্ছে তার দৃষ্টান্ত প্রভূত ঐশ্বর্যশালী আমেরিকা কিম্বা অন্য কোনো পশ্চিমী দেশে দেখা যায় না।

১৯১৫ সালে রুশদেশে ছাত্রের সংখ্যা ছিল মাত্র সাড়ে নয় লক্ষ। আজ সেখানে তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সাড়ে তিন কোটি। অর্থাৎ জন-সংখ্যার এক-চতুর্থাংশই ছাত্র। আর ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের সংখ্যাও অনেক বেড়ে গিয়েছে। ১৯১৫ সালে তাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩ লক্ষ, আজ হয়েছে ২০ লক্ষ।

সোভিয়েতের এই বিরাট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় শিক্ষকদেরই যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করতে হয় এবং এই শিক্ষার ফলাফল যে তাঁদেরই উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে তা বলাই বাহুল্য। সোভিয়েতে ও আমেরিকায় সমাজে শিক্ষকদের স্থান, তাঁদের ট্রেনিং তাঁদের বেতন, ছাত্রদের শিক্ষার খরচ, স্কলারশিপ ইত্যাদি সম্বন্ধে পরবর্তী সংখ্যায় অলোচিত হবে।

ভ্রম সংশোধন

বিজ্ঞাপন ১—৮
সম্পাদকীয় ৯—১৬
পড়িতে হইবে

বিশেষ ঘোষণা

অক্টোবর সংখ্যা **"মানব-মন"** বর্দ্ধিত কলেবরে বিশেষ সংখ্যা হিসেবে বের হবে। দাম হবে ২৲। বার্ষিক গ্রাহকদের বেশী দাম লাগবে না। এজেন্টদের ১৫ই সেপ্টেম্বরের আগেই অর্ডার দিতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

'গত সংখ্যায় প্রকাশিত 'জাতীয় মানসিকতার রূপায়ণে ইতিহাসের ভূমিকা' নামে ধারাবাহিক প্রবন্ধটির শেষ অংশটুকু এই সংখ্যায় অনিবার্য কারণ বশতঃ প্রকাশ করা গেল না। আগামীবারে বাকি অংশটুকু প্রকাশিত হবে।

মনোরোগীর স্বরূপ নির্ণয়

ডাঃ অজিতকুমার দেব

মনোরোগীকে পরীক্ষা করিবার সময় তুইটি বিষয় সবিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রথমত রোগীকে যখন পরীক্ষা করা হইতেছে সে সময় তাহার নিকট অন্য কেহ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। রোগীকে পৃথকভাবে পরীক্ষা না করিলে সে মনের কথা অবাধে ব্যক্ত করার সুযোগ পায় না। ইহা ছাড়া তাহার গোপনীয় কথা অন্যে জানিতে পারিবে এরূপ ভাবার মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা নাই। বেশী জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়া রোগীকে যতবার সম্ভব স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে কথা বলিতে দিতে হইবে। ঐরূপে রোগী মানুষটি কি প্রকৃতির সে সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা যায়। বিচারালয়ে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে রোগীর মাথা খারাপ হইয়াছে কিনা সঠিক নির্ণয় করা সম্ভব নয়। ইহাপেক্ষা রোগীকে নিভৃতে কিছুকাল পর্যবেক্ষণ করিলে এবং তাহার সহিত আলাপ আলোচনা করিলে তাহার মনোভাব যথাযথ জানা যায়। রোগীর অপ্রাসঙ্গিক বা অদ্ভুত উক্তি এবং যুক্তিগুলি অবিকল লিখিয়া রাখিলে ঐগুলি পরে নিদর্শনপত্রে উল্লেখ করিবার সুবিধা হয়। রোগী কথা না বলিলে তাহার চেহারা, আকার ইঙ্গিত, পোশাক পরিচ্ছদ বসিবার ও দাঁড়াইবার ভঙ্গী ও ব্যবহারের সাহায্যে তাহার মনের অবস্থা অনুমান করা যায়। যে রোগী কথা কহিতে একেবারেই অনিচ্ছুক তাহাকে কাগজ পেন্সিল দিলে সে কিছু লিখিতে বা আঁকিতে পারে। রোগীর লিখন এবং চিত্রাঙ্কন হইতেও তাহার মনের ভাব যৎকিঞ্চিৎ জানিতে পারা যায়।

রোগী কি বই পড়ে, কি ধরনের সিনেমা দেখে, তাহার কোন সখ বা খেলাধুলার অভ্যাস আছে কিনা, সঙ্গীতে অনুরাগ, বন্ধুবান্ধব, স্কুল, অফিস, কর্ম্মস্থল, রাজনীতি, ধর্মবিশ্বাস, খাদ্যস্পৃহা, মাদক সেবন প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে তাহার মনের গতি এবং আগ্রহের সন্ধান পাওয়া যায়। মনোরোগীর নিকট অসুখের প্রশ্ন সোজাসুজি উত্থাপন না করিয়া সাধারণভাবে কথাবার্তা চালাইলে প্রয়োজনীয় অনেক তথ্য সংগ্রহ করার সুবিধা হয়। মনোরোগ সম্বন্ধে নানা সংশয়, সন্দেহ ও ভ্রান্ত ধারণা থাকায় মনোরোগের কথা যতটা না বলা যায় ততটাই ভাল। রোগীর পূর্ণ পরিচয় পাইতে হইলে তাহার ছেলেবেলার কথা জানিতে হইবে বিশেষ করিয়া তাহার বাবা, মা, ভাইবোন, ভালবাসা, অভাব অভিযোগ বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে। ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা করিবার সময় প্রত্যক্ষ প্রশ্নের পরিবর্তে ছবি, খেলনা, পুতুল এবং সাধারণ জিনিসপত্র সম্বন্ধে তাহার মতামত জিজ্ঞাসা করিলে চিকিৎসকের সঙ্গে তাহার অন্তরঙ্গতা সহজে স্থাপিত হয়। ইহার পর সে মনের কথা ব্যক্ত করিতে দ্বিধাবোধ করে না।

রোগী সহযোগিতা না করিলে দৈহিক পরীক্ষা দ্বারা তাহার মন অন্যদিকে আকৃষ্ট করিলে তাহার প্রতিবন্ধকতা শিথিল হইতে পারে। কোন কোন রোগী টর্চ, পারকাশন হাতুড়ী প্রভৃতি যন্ত্রপাতি দেখিলে ঘাবড়াইবার পরই সেক্ষেত্রে ঐগুলি সরাইয়া ফেলিতে হইবে। অনেকে আবার বিবরণ লেখা পছন্দ করে না। রোগীর ধারণা ঐগুলি পরে দলিল বা সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইবে। ঐরূপ রোগী কোন কাগজপত্রে নিজের নামধাম লিখিতে ঘোরতর আপত্তি জানায়। অবশ্য যে রোগী চিৎকার করিয়া বলে 'আমি পাগল নই,'

যাহারা আপনাকে আনিয়াছে তাহাদের মাথা ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখুন, তাহার অস্বাভাবিকতা তাহার ব্যবহারেই সুপরিস্ফুট। দ্বিতীয়ত রোগীর আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও সহচরদের সহিত আলাপ আলোচনা করিতে হইবে তাহার অগোচরে। রোগীর সমক্ষে তাহার বিষয় অনুসন্ধান করিলে অযথা বাদ-প্রতিবাদ, মনোমালিন্য ও তিক্ততার সৃষ্টি হয়। যিনি সংবাদ দিবেন তাঁহার নাম এবং রোগীর সঙ্গে তাঁহার কি সম্বন্ধ বা পরিচয় তাহা লিখিয়া রাখা দরকার। তাঁহার বিবৃতিও অবিকৃতভাবে লিখিয়া রাখিতে হইবে। একাধিক ব্যক্তির নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহ করিলে প্রকৃত রহস্য উদঘাটিত হয়। রোগীর পক্ষ হইতে বিচার করিলে এক ব্যক্তির উক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যুক্তিযুক্ত নয়। রোগীর আত্মীয় পরিজনের মধ্যে আর কাহারও মানসিক ব্যাধি হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে প্রথমেই নঙর্থক উত্তর পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাদের যদি প্রশ্ন করা যায় পরিবারে কে কে জীবিত আছে. তাহারা কোথায় আছে এবং কি করিতেছে এবং যাহারা মৃত তাহারা কত বয়সে কিভাবে মারা গিয়াছে. রোগীর মামার বংশে কে জীবিত এবং কে মৃত ইত্যাদি তাহা হইলে প্রকৃত ব্যাপার ক্রমশ প্রকাশ পায়। জ্ঞাতিকুটুম্ব যাহারা রোগীকে চিকিৎসার্থ লইয়া আসে তাহাদের ব্যবহারেও অনেক সময় নানা অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হয়। রোগী এবং আত্মীয় কুটুম্বের ব্যবহারে বিশেষ প্রভেদ না থাকিলে রোগীর অস্বাভাবিকতা সহজে তাহাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। একারণে রোগ প্রবলভাবে দেখা না দিলে রোগ চিনিতে বিলম্ব হয়। রোগীর নিকট আত্মীয়কে প্রায়ই এরূপ মন্তব্য করিতে শুনা যায়, 'আপনি প্রশ্ন করিয়া বুঝিতেই পারিবেন না যে উহার মাথা খারাপ হইয়াছে।' অভিজ্ঞ চিকিৎসক অবশ্য জানেন যে রোগী কি উত্তর দিতেছে তদপেক্ষা কিভাবে উত্তর দিতেছে, তাহার গুরুত্ব সমধিক। তাহা ছাড়া বাহিরের লোকের চোখে রোগীর অস্বাভাবিকতা সহজেই ধরা পড়ে।

তৃতীয়তঃ স্কুলে, অফিসে, কর্মস্থলে বা ক্লাবে যেখানেই রোগীর গতিবিধি আছে সেখানেই সংবাদ লইতে হইবে, রোগীর ব্যবহারে অস্বাভাবিকতা কিভাবে এবং কতদিন যাবৎ লক্ষ্য করা যাইতেছে। এই প্রকার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ সমাজসেবীর সাহায্য বিনা সম্ভব হয় না। মানসিক ব্যাধির স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইলে রোগীর সমগ্র জীবন পর্যালোচনা করিতে হইবে, যেহেতু মানসিক ব্যাধির উৎপত্তি কোন একটি কারণের মধ্যে নিহিত থাকে না। পরিশেষে রোগীর সহিত আত্মীয় পরিজনের যথার্থ সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে হইলে উহাদের সহিত সম্মিলিত সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন আছে। কোনরোগীকে সম্যকভাবে পরীক্ষা করা কত জটিল ও সময়সাপেক্ষ তাহা পূর্বোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতেই উপলব্ধি করা যায়। এ স্থলে তাড়াহাড়া করিলে সকল প্রয়াস পণ্ড হইবার সম্ভাবনা। সাধারণত চিকিৎসককে অল্প সময়ের মধ্যে বহুরোগীর চিকিৎসা করিতে হয় বলিয়া তাঁহার পক্ষে একটি রোগীর জন্য এত সময় অতিবাহন করা সম্ভব নয়। এ কারণেই বিশেষজ্ঞের সাহায্যের প্রয়োজন হয়।

সম্পাদক—ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক—অরুণ চক্রবর্তী
ডাঃ জ্যোতির্ময় শর্মা কর্তৃক অভ্যুদয়, ৩০, সূর্য সেন ষ্ট্রীট, কলি-৯ থেকে মুদ্রিত ও ডাঃ সোমনাথ মুখার্জি কর্তৃক
১৩২/১এ. কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত।

IMPORTANT BOOKS FROM MOSCOW

Popular Science

LEV POTKOV :	A World We Do not see	0·94
Alexander Popov :	Inventor of Radio	0·94
O. SCHMIDT :	A Theory of Earth's Origin	1·25
A FERSMAN :	Geochemistry for Everyone	4·44
A STERNFIELD :	Inter-planetary Travel	0·69
L. FRIDLAND :	Paths of Science	2·81
A. YOFFE :	Semi-Conductors and Their Use	0·31
S. VAVILOV :	The Eye and The Sun	0·75

Medical Science

M. GRASHCHENKO & LISITSYN :	Achievements of Soviet Medicine	0·50
A SOIYANIK :	Cancer And Its Prophylexis	0·37
V. KAZANSKY :	Cancer, Its Prevention	0·37
A IVANOV :	Essays on the Pathophysiology of the Higher Nervous Activity	2·87
O. MAKEYEVA :	Prevention of Maternal and Infant Diseases	3·12
V. ZELENIN :	Stengthen Your Heart	1·87
K. BYKOV :	Text Book of Physiology	8·44
I. VELVOVSKY & OTHERS :	Painless Childbirth Through Psychoprophylaxis	6·25

NATIONAL BOOK AGENCY PRIVATE LTD.

12, BANKIM CHATTERJEE STREET, CALCUTTA-12.

172, Dharamtala Street
Calcutta-13

Nachan Road, Benaehity,
Durgapur-4

V/O MEZHDUNARODNAYA KNIGA MOSCOW 200 U. S. S. R.